শ্রীধর্ম্মদাস মিত্র

প্রাপ্তিস্থান
ইষ্টার্ণ-ল-হাউস
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দাম ছয় আনা

প্রকাশনা
আরতি এজেন্সি
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ : : কার্ত্তিক ১৩৪

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫ নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন মিত্র

শ্রীমান্ কাননকুমার মিত্র

স্নেহাস্পদেষু

লেখকের নিবেদন

'পাঠশালা,' 'ভাইবোন,' 'কৈশোরিকা' 'জলছবি' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কয়েকটি গল্পকে একত্রিত ক'রে "খাদে ডাকাতি" প্রকাশিত হ'ল। গল্পগুলি পত্রিকায় প্রকাশের সময় শিশুদের উচ্ছ্বসিত কলরোলে, তাদের কচি প্রাণের যে আনন্দের আভাস পেয়েছিলাম, তাই আমাকে বইখানি প্রকাশে অনুপ্রাণিত করেছে। এরপর বইখানি প'ড়ে যদি কিশোর ও শিশুরা আনন্দ পায়, তবেই শ্রম সার্থক জ্ঞান ক'রব।

খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিক ও সম্পাদকদের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছি ; আজ এই অবসরে সেই-সকল শুভাকাঙ্ক্ষী ও মঙ্গলকামীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রে ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করলাম। ইতি ;

পুরুলিয়া, নড়িহা
বড়দিন, ১৯৩৮

বিনীত—শ্রীধর্ম্মদাস মিত্র

বাংলা সাহিত্যের এখন অত্যন্ত দুর্দ্দিন, কারণ পাঠকের চেয়ে লেখকের জনসংখ্যা দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে। বড়দের আসরে যে সব অপটু হাতের অক্ষম রচনার স্থান হয় না, তাই সামান্য অদলবদল করিয়া 'শিশু সাহিত্য' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে এইটাই বিশেষ আশঙ্কার কথা। ছোটদের মন বুঝিয়া তাহাদের উপযোগী কথাসাহিত্যের যোগান্ দেওয়া যে অধিকতর দুঃসাধ্য কাজ, এ কথা অনেক নাবালকের বোধগম্য না হওয়াতেই যন্ত্রণা বাড়িয়াছে বেশী। তাই পুরাতন সূর্য্য যখন অস্তাচলে, তখন নবীনকে আহ্বান করিতেই হইবে, যে নবীনের আছে নূতন কর্ম্মপ্রেরণা ও অক্ষত উৎসাহ। এই বইখানির লেখক শ্রীমান্ ধর্ম্মদাসের লেখনীতে সেই শক্তির আভাস পাইয়াছি, যে শক্তির অনুসন্ধান আমরা করি। শিশু সাহিত্যে এই নবীন লেখকটি আমার নিজের আবিষ্কার, তাই তাহার যাত্রাপথে শুভকামনার জয়মাল্য অর্পণ করিতে আমার ইতস্ততঃ করিবার কথা নয়। তরুণ পাঠকবর্গ এবং তাহাদের অভিভাবকদের আমি এই বলিয়া আশ্বস্ত করিতে পারি যে, অপাঠ্য বইয়ের ভিড়ে সত্যকারের শিশুদের উপযোগী একখানি সুপাঠ্য গল্পসঞ্চয়ন পাওয়া গিয়াছে।

বড়দিন ১৯৩৮

ভাইবোন্ কার্য্যালয়

৭, রাজাবাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

★ ★ ★

পুস্তক তালিকা

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

আমাদের বই নিঃশঙ্ক
চিত্তে ছেলেমেয়েদের
হাতে তুলে দেওয়া যায়

রাত গভীর। তায় আবার শীতের রাত। বাইরে অমাবস্যার অন্ধকার। গড়গড়ায় শেষ টান দিয়ে ঠাকুর্দ্দা বলতে আরম্ভ করলেন—অনেক দিনের কথা। বছর কুড়ি পঁচিশ হবে বোধ হয়। আজকাল বর্দ্ধমান জেলায় যেখানে বর্দ্ধিষ্ণু উখ্‌রা গ্রাম রয়েছে না, ঠিক সেইখানে ছিল, মনোহরপুর কলিয়ারী; কয়লার খাদ। একথা জানিস ত, রাণীগঞ্জ সীমানায় অনেকদিন থেকেই কয়লা পাওয়া যায়, খুব বেশী পরিমাণে। আমি তখন কাজ করতাম রাণীগঞ্জের কাছাকাছি সেই মনোহরপুর কলিয়ারীতে। তখনকার দিনে মনোহরপুর কলিয়ারীর মত বড় কলিয়ারী এদেশে বেশী ছিল না; সাহেব সুবোরাও তাই মোটা মাইনে নিয়ে

ঐখানেই কাজ করতে আসত। আমি ছিলাম, খাদের ক্যাসিয়ার-বাবু। অনেক দিন বিশ্বস্তভাবে কাজ করে এসেছি, তা ছাড়া ধর্ম্মভীরু লোক; সেইজন্যই আমাদের সাহেব, টেন্‌ডেনের আমার উপর ছিল অগাধ বিশ্বাস। প্রথম প্রথম প্রতিদিনকার কয়লা বিক্রীর টাকা রাণীগঞ্জের থানায় জমা দেওয়া হ'ত। কিন্তু তাতে ছিল অনেক অসুবিধা; সেইজন্য একদিন সাহেব আমাকে ডেকে ব'ললে,—বাবু! তুমি এই খাদে অনেকদিন কাজ করছ, তোমাকে ছাড়া আর কারও ওপর আমার বিশ্বাস নাই; আমি তোমাকেই বলছি, তুমি আমার একটা কথা রাখবে?

একে রাজার জাত, তায় আবার এমন মিষ্টি কথা; আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ইংরেজি বাংলায় মিশিয়ে কোনরকমে ভাব প্রকাশ করলাম,—হুজুরের কাজে আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

সাহেবও এই চাইছিল বোধ হয়; আমার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ব'লতে সুরু ক'রলে—প্রতিদিনকার কয়লাবিক্রীর টাকা, আমি তোমার কাছেই জমা রাখতে চাই বাবু; তোমার এতে আপত্তি নেই ত?

প্রথমটা সাহেবের কথায় যে ভাবে উৎসাহিত হ'য়ে উঠেছিলাম সাহেবের প্রস্তাবের পর সেই উৎসাহ, ভয়ে আকাশগামী ফানুসের মত এক মুহূর্ত্তে উবে গেল। কারণ, আমি থাকতাম, খাদের কোয়ার্টারে। চারপাশে দু'চারজন বাবু ও সাহেবদের কোয়ার্টার; বাকী সব কুলীদের বস্তি। অত টাকা এমন ক্ষেত্রে নিজের

বাড়ীতে রাখা মোটেই নিরাপদ ছিল না, তাও নিজের টাকা হ'লে, তেমন কিছু হ'ত না; টাকা কোম্পানীর। হারালে বা চুরি গেলে, কোন কৈফিয়ৎ শুনবে না; একেবারে হাতকড়ি।

একদিকে চুরি যাবার ভয়, অপরদিকে সাহেবের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছি, দোটানায় প'ড়ে গেলাম। শেষ পর্য্যন্ত টাকার থলেটি হাত পেতে সাহেবের কাছ থেকে নিতেই হ'ল; এবং বণ্ডেও সই করে দিলাম। বাড়ী ফিরে তোদের ঠাকুরমার কাছে, সমস্ত ঘটনাটা বললাম; এমন কি টাকাগুলি গচ্ছিত রাখার জন্য, একদিনে পঞ্চাশটাকা মাইনে বেড়ে গেল, এ সুখবরটাও দিতে ভুললাম না। তোদের ঠাকুরমা ত মাইনে বাড়ার কথা শুনেই উল্লসিত হয়ে উঠলেন; টাকা চুরির ভয় তাঁর মনেও স্থান পেল না।

···দিনকুড়ি কাটলো নিরাপদেই। প্রতিদিনের কয়লাবিক্রীর টাকা আমার কাছে জমে, টাকার থলি ক্রমশঃ ভারি হ'য়ে উঠে। এমনিভাবে শেষমাসে আমার কাছে জম্‌ল, বার হাজার টাকা।

কুলীমজুরদের মাইনে প্রতিমাসে আমাকেই বিলি করতে হ'তো। এবারও পূর্ব্বের মতই সাহেব আমাকে ডেকে ব'ললে —বাবু! তোমার কাছে প্রতিদিন—বিক্রীর হিসেবে কতটাকা জমেছে?

হিসেবের খাতাটা সাহেবের চোখের সামনে মেলে ধ'রে ব'ললাম—বার হাজার টাকা, হুজুর!

কাগজটার উপর কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে নিয়ে সাহেব ব'ললে —এক কাজ কর বাবু। ক'লকাতার ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বের করে আনা অনেক ঝঞ্ঝাট্। তাছাড়া প্রতিমাসে লোক এবং পুলিশ যাওয়ার ট্রেনভাড়ায় অনেক বাজে খরচ হ'চ্ছে। তা'র থেকে, তোমার কাছে, ডেলি-সেলের যে টাকাটা জমেছে, সেই থেকেই কুলীমজুর ও বাবুদের মাইনেটা কাল দিয়ে দাও।···বাবু, সাহেব আর কুলীদের মোট কতটাকা মাইনে দিতে হয় ?

বিনীতভাবে ব'ললাম—সাত হাজার।

সাহেব উত্তর দিলেন—ওই টাকা থেকে সাতহাজার খরচ ক'রে, বাকী পাঁচহাজার তোমার কাছেই রেখে দাও ; আগামী মাসের একাউন্টের সঙ্গে এই টাকাটাও যোগ করে দিও।

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে, সাহেবের কাছ থেকে ফিরে, নিজের আফিসে স্থির মনে বসে প্রমাদ গ'ণলাম। খাদ ; জায়গা খারাপ। এমন কি ক'লকাতার ব্যাঙ্ক থেকে, দিনের বেলায় মাইনের টাকা বের ক'রে আনা হ'ত, পুলিস ঘেরাও করে, অতি সাবধানে। আর আজ আমাকে বার হাজার টাকা বের করে আনতে হবে, আমার খাদের কোয়ার্টার থেকে। কেউ যদি দেখতে পেয়েছে তবে সেই রাত্রেই বাড়ীর সবক'টি প্রাণীর প্রাণ বাঁচানো বিপদ হ'য়ে উঠবে। টাকা ত চুরি যাবে নিশ্চয়ই !

কিন্তু, হুকুমের চাকর আমি, ন্যায় অন্যায়ের বিচার বা প্রাণের ভয় ক'রলে আমার চ'লবে না। তা' ক'রলে হয়ত চাকরিও

টি'কবে না। অগত্যা চিন্তান্বিত ভাবেই কোয়ার্টারে ফিরলাম। এতদিন টাকা রেখেছিলাম, গোপনে। পরদিন যখন সকলে জানবে, ক'লকাতায় টাকা আনতে লোক যায়নি ; টাকা বেরুচ্ছে, ক্যাসিয়ার বাবুর বাড়ীর থেকে ; রাত্রির মধ্যে সমস্ত বাড়ী চড়াও ক'রে লুট করে নিতে কতক্ষণ ?

পরদিন, যথাসময়ে টাকার থলেটি হাতে নিয়ে আফিসে যাচ্ছি ; পথে মুখোমুখী কুলী-সর্দ্দার মংরুর সাথে দেখা। মংরু তা'র স্বভাবসুলভ হাসি হেসে ব'ললে—ক্যাসারবাবু! হামদের মাইনা আজ দিবি নাই ? থলিটির পানে তার লোলুপ-দৃষ্টি।

অকারণেই বুকটা কেঁপে উঠল। তবুও চেপে ব'ললাম—দোব বৈ কি, মাইনে দোব না আবার! পরে সে যা' উত্তর দিল, তার ভাবার্থ এই যে, ক'লকাতায় লোক না যাওয়াতে তা'রা ভেবেছিল, হয়ত মাইনে দেওয়া আজ হবেনা। কিন্তু, ক্যাসিয়ারবাবুর বাড়ীতে মাইনের টাকা রাখা আছে দেখে তারা খুসি হ'য়েছে।

কাউন্টারের ভেতর বসে, প্রত্যেকের মাইনের টাকা পৃথক পৃথক ভাবে সাজিয়ে রাখলাম। তারপর মাইনে নেওয়ার ঘণ্টা বাজলো। মাহিনা-প্রত্যাশী কুলীমজুরের কলরোলে মুখরিত হ'য়ে উঠলো কাউন্টারের চারিদিক। মাইনের টাকা বাদ, আঁমার পাশের থলিতে, তখনও পাঁচহাজার টাকা! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যুকে যেমন সপ্তরথীতে ঘিরে বধ ক'রেছিল, আমার অবস্থাও তখন তাই। চারিদিকে কুলীমজুরেরা মাইনে নেবার

জন্য চীৎকার সুরু করেছে। কাউণ্টারের ভেতর আমি যখের মত টাকাগুলি আঁকড়ে ব'সে আছি। ভয়, বিস্ময় ও কাজের চাপে প্রাণ বেরুবার জোগাড়। একে একে মাইনে দিতে দিতে প্রায় সন্ধ্যে হ'য়ে গেল। খাদের সিটি বেজে উঠে ছুটির কথা প্রচার করল। যারা মাইনে পেয়ে গিয়েছিল, তা'রা ছুটল আপন আপন ঘরের দিকে। বাকী ক'জনের মাইনেও দিয়ে ফেললাম আধ ঘণ্টার মধ্যে।

এতক্ষণ ভাববার পর্য্যন্ত সময় পাইনি। কিন্তু এখন মনে হ'ল এতগুলি টাকাশুদ্ধ থলিটি নিয়ে এই রাত্রির অন্ধকারে কোয়ার্টারে ফিরবো কি করে? কুলীরা টাকা দেখে গেছে। তারাও অতর্কিতে রাস্তায় আমায় আক্রমণ করতে পারে।

সাহেবের কাছে সোজা গিয়ে ব'ললাম—হুজুর, So many rupees, no safe to go home; ক'জন আদমি সাথমে দিয়ে দিন।

সাহেব আমার ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখেই হয়ত একটু করুণার হাসি হেসে ক'জন আফিসের প্রহরীকে আমার সঙ্গে দিলেন, আর একথাও বললেন—বাবু! তুমি ভুল করেছ। এতটাকা একসঙ্গে বাড়ী থেকে বের করে না এনে, সাতহাজার নিয়ে এলেই চ'লত।

মনে মনে ব'ললাম—তোমার যখের ধন গচ্ছিত রাখতে, আমার যে কি অবস্থা হ'য়েছে, তা তুমি কি করে বুঝবে সাহেব!

বাড়ীতে পৌঁছে ভুলবশতঃ সঙ্গের প্রহরীগুলোর মুখের উপরই দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর ভেতর থেকেই বলে দিলাম তা'রা এখন যেতে পারে। তা'দের পায়ের জুতোর শব্দ দূর হ'তে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল। তোদের ঠাকুরমার হাতে থলেটি দিয়ে খেয়ে দেয়ে দরজায় খিল এঁটে শুয়ে পড়লাম। তোদের বাবা, কাকা তখন ছেলেমানুষ; তারা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর আমারও তন্দ্রা এসেছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, না তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলাম, ঠিক ব'লতে পারি না। হঠাৎ খট্ খট্ আওয়াজে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। চোখদুটি রগড়ে নিয়ে ভাল করে কান খাড়া করলাম। হ্যাঁ সত্যিই আমি জেগে উঠেছি, এবং বাইরের দরজায় কে কড়া নাড়ছে। তোদের ঠাকুরমারও সে শব্দে ঘুম ভেঙ্গেছিল। দুজনে দুজনের মুখের পানে তাকিয়ে ভয়ে কাঁপছি; গায়ের লোমগুলো খাড়া হ'য়ে উঠেছে। ধর্ম্মভীরু লোক আমি, বিপদে পড়লে ভগবানকেই ডাকি; সেইজন্যে ইষ্টনাম জপ করতে লাগলাম—বিপদ-তারণ মধুসূদন! রক্ষা কর।

ততক্ষণে ধুপ্ ধুপ্ ক'রে দুটো শব্দ হ'ল; ঠিক বুঝলাম, কলিয়ারীর কোয়ার্টারের ছোট প্রাচীর ডিঙোতে চোরের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তারপরেই বাইরের দরজায় খিল খোলার শব্দ ও অনেকগুলি পায়ের আওয়াজ। সে শব্দ ক্রমশঃ আমাদের শোবার ঘরের দরজায় এসে থামল ও দরজার কড়া নড়ে উঠতে লাগল জোরে জোরে; সেইসঙ্গে গুরুগম্ভীর স্বরে বাইরে থেকে

কে বলে উঠলো—দরজা খোল ঃ দরজা খোল শীগ্‌গির, না হ'লে দরজা ভাঙব। কড়া নাড়ার চোটেই একটি-ইটের-গাঁথনি পাকা ঘরের ভিত্তি পর্য্যন্ত কেঁপে উঠতে লাগল। দরজার খিলটাও ক্রমশঃ ঢিলা হয়ে আসছে। চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তখন শরীরে এমন শক্তি নাই যে, দু'পা গিয়ে দরজা খুলে দিই, অথবা চীৎকার করি। অতিকষ্টে দুটি কথা মুখ দিয়ে বেরুল —খুলছি বাবা।

দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে একমুহূর্ত্ত ভেবে নিয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে দরজা খুলে দিলাম। কারণ, ভাবলাম দরজা যদি নিজের থেকে খুলি, তবে হয়ত ডাকাতেরা প্রাণে নাও মারতে পারে। কিন্তু যদি কষ্ট ক'রে তা'দের দরজা ভাঙতে হয়, তবে তার প্রতিশোধ, ওরা আমাদের প্রাণের ওপরই নেবে। দরজা খুলেই দেখলাম দরজার বাইরে ক'জন জোয়ান লোক দাঁড়িয়ে; হাতে তাদের বড় বড় ধারাল টাঙি, অন্ধকারের মধ্যেও জ্বল জ্বল করে উঠছে। সমস্ত ঘরখানাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে একবার পরীক্ষা করে নিয়ে সামনের লোকটা আমায় ব'ললে—টাকা কোথায় ?

সতীসাধ্বী স্ত্রীলোক ছিলেন, তোদের ঠাকুরমা। আমার জীবন বিপন্ন দেখে, নিজের প্রাণের এতটুকু মায়া না করে, সামনে এগিয়ে এসে ব'ললেন—কিসের টাকা বাবা ?

লোকটা ব'ললে—চালাকি রাখ; টাকা দাও; নইলে এই দেখছ ত। হাতের টাঙ্গিটা শূন্যে একবার আন্দোলিত হ'ল।

তোদের ঠাকুরমা এতক্ষণে যেন বুঝতে পেরেছেন এমনি ভাব দেখিয়ে ম্লান হেসে বললেন—ওঃ! তোমরা খাদের টাকার কথা

টাকা কোথায়?

ব'লছ? সে টাকা ত আজ মাইনে দেওয়া হয়ে গেছে বাবা। বিশ্বেস না হয়, এসো আমার সঙ্গে। উনি পাশের ঘরটার দিকে পা বাড়িয়ে দিলেন; ডাকাতেরা তাঁকে অনুসরণ করল। আমার

তখনকার মনের অবস্থা বলে বোঝান অসম্ভব। সমস্ত শরীরটা ঘামে ভিজে উঠছে আর থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে। তখন ভাবছিলাম টাকা যাক্, জেল খাটব। তবু যদি এতগুলি প্রাণীর প্রাণ বাঁচে।

কয়েকটা মুহূর্ত্ত আমার এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে কেটে গেল। তোদের ঠাকুরমা যে তখন ওঘরে কি করছেন, বেঁচে আছেন, না ডাকাতের হাতে প্রাণ দিয়েছেন, তাও জানিনা।

হঠাৎ তোদের ঠাকুরমা ছুটে এসে ব'ললেন—ওগো এসো, ধরেছি।

অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করলাম—কি ধরেছ?

—চোর ধরেছি গো! সব ক'টাকে বন্দী করেছি, ঘরের মধ্যে শেকল দিয়ে। তুমি এবার যত পার চীৎকার কর। আমার শরীরে তখন বল ফিরে এসেছে; কণ্ঠে ভাষা ফিরে পেয়েছি। খুব জোরে চীৎকার স্থরু করলাম—চোর—চো—র।

পাশেই ছিল সাহেবদের আর বাবুদের কোয়ার্টার; তারা চীৎকার শুনে ছুটে এলেন। সাহেব বাইরে থেকে বন্দুকে ক'টা ফাঁকা আওয়াজ ক'রলেন। এবং আমার কাছে এসে গর্ব্ব প্রকাশ ক'রে ব'লতে লাগলেন—বাবু! ডাকু বাগ গিয়া, by the blast of the gunpowder.

হেসে ব'ললাম—অল্ কন্‌ফাইণ্ড; গিন্নী do sir.

সাহেব এবং অন্যান্য সকলেই ব্যাপারটা বুঝে আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন। থানায় খবর দেওয়া হ'ল; অনেক পুলিশ সঙ্গে নিয়ে,

এল হরেন দারোগা। তোদের ঠাকুরমার জবানবন্দীতে জানতে পারা গেল, তাঁর কাছ থেকে চাবি নিয়ে প্রথমে ডাকাতরা আয়রন্‌চেস্‌টা খুলতে গেল। তিনি তখন বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে; এবং ডাকাতদের তু'জন দরজায় কড়া পাহাড়া দিচ্ছে। অনেকদিন অব্যবহৃত থাকায় সেটা এমন এঁটে গিয়েছিল যে, তিনজন মিলেও সেটাকে খুলতে পারছিল না। তখন অবশিষ্ট তু'জনও ভেতরে গেল। গিন্নী সেই মুহূর্ত্তে সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে দরজায় শেকল টেনে ডাকাতদের ঘরের মধ্যে বন্দী করে ফেলেছিলেন।

দরজা খোলা হ'লে দেখা গেল, ডাকাতদের সর্দ্দার হ'য়ে এসেছে, কুলীসর্দ্দার মংরু। সাহেবদের, বাবুদের ও আমার কণ্ঠ থেকে একসাথে তীব্রধ্বনি বেরুলো—মংরু!

হরেন দারোগা কিন্তু অন্য সুর গাইলো। তার চোখতুটো হ'য়ে উঠল উজ্জ্বল। ডাকাতদের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিতে দিতে সে সাহেবের দিকে চেয়ে যা' ব'লল, তার ভাবার্থ এই—এই ডাকাত সর্দ্দারের খোঁজেই পুলিস এতদিন ঘুরছিল। এ হ'চ্ছে এই তল্লাটের একজন নামজাদা ডাকাত, চরণ সিং। সে নানা জায়গায় নানা বেশভূযা ধ'রে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। বহুদিন পরে আজ এক বীর রমণীর উপস্থিত-বুদ্ধির জন্য পুলিস তাকে গ্রেপ্তার ক'রতে পেরেছে। সাহেব আমাকে পুরস্কার দিতে চাইলেন এবং আমাকে গোপনে ডেকে

ব'ললেন—বাবু! তোমার স্ত্রী সাহসী ও বুদ্ধিমতী সন্দেহ নাই, কিন্তু কোম্পানীর টাকাগুলো কোথায়?

তোদের ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম—তিনি সন্ধ্যে-বেলাতেই সেগুলো ভাঁড়ার ঘরে চালের হাঁড়ির ভেতর রেখে দিয়েছিলেন।

সাহেব যারপরনাই খুশি হয়ে বললে—কালই তোমার মাইনে বাড়িয়ে দোবো বাবু; কিন্তু হরেন দারোগা আমাকে গোপনে ডেকে বললে—শুনছেন মশায়; চরণ সিংহের প্রকাণ্ড দল; যে যতবার ওকে ধরিয়ে দিয়েছে, তাঁকে সবংশে প্রাণ দিতে হয়েছে, ওর দলের হাতে। আপনি কালই চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ী চলে যান; প্রাণে বাঁচলে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবেন। আমিও পরদিন সকালেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ী ফিরলাম। এই পর্য্যন্ত বলে ঠাকুর্দ্দা থামলেন। আমরা স্তম্ভিত, বিস্মিত ও ঠাকুরমার বীরত্বে মুগ্ধ।

সবেমাত্র সন্ধ্যে উত্‌রেছে।···

ঘনায়মান অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে নীল আকাশের বুকে ফুটে উঠেছে, এক একটি উজ্জ্বল তারা। মনে হচ্ছে, কেউ যেন অলক্ষ্যে বসে একটি নীল পাথরের থালার ওপর সোনার জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। পাখীরা কূজন থামিয়ে ফিরে গেছে কুলায়; তাদের স্থান পূর্ণ করেছে জোনাকী,—অশ্রান্ত ঝিল্লিরবে।···নীল নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে বাগানের ভেতর মুখোমুখী দু'টি চেয়ারে বসে আছি আমি আর মিণ্টু, আমার আদরের ভাগিনেয়ী।—'একটি গল্প বলনা মামা?'—কিসের গল্প ব'লব বুড়ীমা? তার কৌতূহলী উৎসুক দৃষ্টির ওপর নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জিজ্ঞেস ক'রলাম।

—'কেন, ভূতের গল্প'। দ্বিধাহীনকণ্ঠে সে জবাব দিল।

আমার স্নেহময়ী ক্ষুদ্র ভাগিনেয়ী; তার সুধামাখা কণ্ঠস্বরে আমি যেন একটা মাতৃকণ্ঠের আহ্বান শুনতে পাই। তার ছোট করস্পর্শে আমার শরীরে ব'য়ে যায় একটা পুলক শিহরণ—কত কোমল, কত স্নিগ্ধ সে স্পর্শ। আমি যেন তার সন্তান, এমনি ভাবে সে আমাকে তার স্নেহ দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়। আমিও তাই তাকে ডাকি, বুড়ীমা ব'লে।

—একে এতেই তুমি সন্ধ্যের পর বাড়ীর বের হ'তে পার না; তার ওপর ভূতের গল্প শুনে ঘরের ভেতর দিনের বেলায় ভূতের ছায়া দেখে যে আঁৎকে উঠবে বুড়ীমা! হেসে ব'ললাম।

—তবে তোমার যা' ইচ্ছে তাই বল'।

—এটা বিজ্ঞানের যুগ; মানুষের প্রতি পদক্ষেপে, বিজ্ঞান ক'রছে তাকে সাহায্য, তা'কে চলাচ্ছে, বলাচ্ছে, তিনমাসের কাজ করে দিচ্ছে তিনদিনে শেষ। তাই তোমাকে ব'লব একটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা।

—বাপ্‌রে; অত বড় বড় কথা বলোনা মামা, সোজা ক'রে বল; যেন আমি বুঝতে পারি; যেন আমিও বুঝিয়ে ব'লতে পারি আর পাঁচজনের কাছে। কথা ক'টা বলে মিণ্টু স্থির হ'য়ে ব'সল।

—শোন; আজ তুমি পৃথিবীটাকে যেমন দেখছ, পৃথিবী এত সভ্য, এত শিক্ষিত এবং এত উন্নত ছিল না আগে। এমন কি একশ বছর আগেকার পৃথিবীর সঙ্গে আজকের পৃথিবীর তুলনা

ক'রলে দেখতে পাবে, জগতটা হুবহু বদলে গেছে। এ যেন সে পৃথিবী নয়, আর একটা পৃথিবী ; কৃষ্টির দিক্ দিয়ে, সভ্যতার দিক্ দিয়ে, মানুষের জীবন-যাত্রার ধারার দিক্ দিয়ে, তা'র সঙ্গে এই পৃথিবীর,—অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের কোনো সামঞ্জস্য নেই।

—বড্ড কঠিন হ'য়ে যাচ্ছে মামা, ঠিক বুঝতে পারছি না। মিণ্টু আমাকে সজাগ ক'রে দেয়। একে বৈজ্ঞানিক নই ; তা'তে বিজ্ঞানের জটিল কথাগুলো একটি ছোট্ট বালিকাকে সহজ ক'রে, সরস ক'রে বোঝাতে হ'বে। তাই একটু চিন্তা ক'রে নিলাম।—তুমি রেলগাড়ীর ইঞ্জিন দেখেছো ত' বুড়ীমা !

কলহাস্যে নিস্তব্ধ প্রকৃতিকে মুখরিত ক'রে মিণ্টু ব'লল—ও হরি, তা' দেখিনি আবার ; কত্তোবার দেখেছি !

—তা ত' দেখেছ ; কিন্তু জানো এটা কিসে চলে ?

—কেন, কয়লায় ; কালো কালো ধোঁয়া ওঠে, দেখিনি আবার !

—শুধু কয়লা ?···পারলে না বুড়ীমা ; কয়লা শুধু সাহায্য ক'রছে। ইঞ্জিনটাকে চালাচ্ছে বাষ্প। জল যখন উনুনের ওপর ফোটে, তা'র থেকে যে ধোঁয়ার মত জলকণাগুলি ওপরে উঠে যায় তারই নাম বাষ্প।

—অতবড় একটা রেলগাড়ী শুধু জলের-ধোঁয়া (বাষ্প) দিয়ে চ'লছে ? অবিশ্বাসের সুরে মিণ্টু বলে !

—হ্যাঁ ; তোমার বিশ্বেস হচ্ছে না ? আচ্ছা, যখন জ্বলন্ত উনুনের ওপর চায়ের জল গরম হয়, তখন জল ফুটতে আরম্ভ

করলে, কেটলির ওপরকার লোহা বা এলুমিনিয়ামের ভারী ঢাক্না, কেমনভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে থাকে দেখেছ ? ঐত সামান্য বাষ্প, তাতে যখন কেটলীর ঢাক্নাটাকে অমন করে নাচিয়ে তোলে; তখন বিরাট একটি জলপাত্রের মুখ, যদি কয়লার অত্যধিক উত্তপ্ত আঁচে, বাষ্প বেরুবার পথ না রেখে বন্ধ ক'রে দেওয়া যায় আর সেই ঢাকনাটার সঙ্গে ইঞ্জিনের চাকার যদি একটা লোহার কিছু দিয়ে যোগাযোগ রাখা যায়, তবে একটা গাড়ীকে টেনে নিয়ে যাওয়া কী ইঞ্জিনের পক্ষে কঠিন হয় !

—না; এতক্ষণে মিণ্টুর কিছু বিশ্বাস হয়।—কিন্তু; মিণ্টু প্রতিবাদ করে। ওটা যে কয়লার ধোঁয়া নয়, জলেরই বাষ্প, তারই বা ঠিক কি ?

কৌতুকের হাসি হেসে জবাব দিলাম—তা'ও বুঝলে না ! আচ্ছা এক কাজ কর; কেটলীতে জল গরম হচ্ছে, ঢাক্নাটা খুলে দাও; যে ধোঁয়াটা উড়ে যাচ্ছে, তার উপর একখানা প্লেন্ কাচ ধর; দেখবে প্রথমে কাচটা কুয়াসাচ্ছন্ন হয়ে উঠবে এবং অল্প পরেই তা'রথেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে থাকবে। এতেই প্রমাণ হয় না কি, জল থেকেই বাষ্পের সৃষ্টি এবং বাষ্পটাকে ধরে আবার সেই জলে ফিরিয়ে আনা যায় ?

জর্জ্জ ষ্টিফেন্শন নামে এক ইউরোপীয় বালক তা'র বাবার সঙ্গে কোথাও যেতে যেতে পথে এক জায়গায় চা'এর জল চড়ান। বালক তাকিয়ে তাকিয়ে একমনে জল গরম হওয়া দেখছিল;

জল যখন কেটলির ভেতরে ফুটে উঠল, তখন তার বাষ্পের ঠেলায় কেটলির ঢাক্‌নাটা ওঠা নামা করতে লাগল। এই সামান্য ব্যাপার দেখেই মেধাবী বালক ষ্টিফেন্‌শন বুঝতে পারলেন, এই বাষ্পকেই আরও উন্নত প্রণালীতে উত্তপ্ত ক'রে চেপে রাখতে পারলে অনেক বড় কাজ এরদ্বারা হওয়া সম্ভব। সেই নিয়ে তিনি পরে গভীর গবেষণা করেছিলেন ; তাঁর গবেষণা থেকেই বর্ত্তমান ইঞ্জিনের সৃষ্টি !

সেদিনকার মত ঐ পর্য্যন্ত বলেই বিশ্রামের জন্য উঠে পড়লাম।

ছেলেমানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। গত রাত্রের ইঞ্জিন বিষয়ক কাহিনীর অল্পই হয়ত' তা'র মাথায় ঢুকেছিল হয়ত বা নীরসও ঠেকেছিল, তাই আজ যখন দিবানিদ্রার আরাধনার চেষ্টা করছিলাম, তখন মিণ্টু এসে ধ'রে ব'সল—আজ রাজপুত্তুরের একটা গল্প বল না মামা ! তাকে প্রত্যাখান করতে পারলাম না ; তবে মনে মনে ফন্দী এঁটে ফেললাম, রাজপুত্তুরের গল্পের ভেতর দিয়েই একটা বিজ্ঞানের তথ্য বোঝাতে চেষ্টা ক'রব।

—আচ্ছা শোন ; একদিন এক রূপকথার রাজপুত্তুর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে স্বপনপুরীর রাজকন্যার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

মিণ্টু উৎসাহিত হ'য়ে উঠল ; তা'র চোখত্ন'টি আনন্দে হ'য়ে উঠল উজ্জ্বল।...দিন যায়, রাত আসে, আবার রাত ফুরুলে দিন

আসে ; এমনি ভাবে মাস কাটে, বছরও কেটে যায়। রাজপুত্তুর মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেন, আবার ঘোড়া ছোটান ; এমনি ভাবে একদিন তিনি এসে পড়লেন এক নিবিড় জঙ্গলের ধারে, তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। রাজপুত্তুর তখন খুবই ক্লান্ত ; বিশ্রাম তাঁর একান্ত দরকার। তা'ছাড়া রাত্রে বনজঙ্গল পার হওয়া তখনকার

কুঁড়েঘরে থাকতো এক রাক্ষস, না মামা ?

দিনে মোটেই নিরাপদ ছিল না। বাঘ, ভাল্লুক আর রাক্ষসে জঙ্গল পরিপূর্ণ ; অগত্যা রাজপুত্তুর আশ্রয়ের জন্য চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, কিছুদূরে একটি কুঁড়েঘরে আলো জ্বলছে ; তিনি সেইদিকে পা চালালেন।

—কুঁড়েঘরে থাকতো এক রাক্ষস না মামা ?

—না না। রাক্ষস নয়, একটা বুড়ো থাকতো সেই কুঁড়েঘরে। সে রাজপুত্তুরকে দেখে সসম্ভ্রমে আশ্রয় দিলে এবং আহারের জন্য ফলমূল জোগাড় করে আনল। রাজপুত্তুর তাই খেয়ে সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলেন। সকাল বেলায় রাজপুত্তুরকে জাগাতে এসে বুড়োটি দেখল রাজপুত্তুরের শরীর নীলবর্ণ হয়ে গেছে; মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়েছে; তিনি মরে গেছেন।

—মরে গেছেন! কেউ মেরে ফেলেছে নিশ্চয়। মণিমুক্তার লোভে কোনও চোরডাকাত কিম্বা কোনও রাক্ষস?

—তোমার তাই মনে হবে; কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা' নয়। তখন ছিল শীতকাল। বুড়োলোকটি রাজপুত্তুরকে যে ঘরে শুতে দিল, সেই ঘরকে গরম রাখবার জন্য জ্বেলে রেখেছিল একটা খোলা উনুন; তার ওপর রাজপুত্তুরের সম্মানের জন্য ঘরটি প্রদীপ দিয়ে সাজিয়েছিল। একে ছোট ঘর হাওয়া বাতাস ঢোকবার বেরোবার পথ নেই, তারপর জ্বলন্ত উনুন আর আলো ইত্যাদি থেকে একরকম বিষাক্ত গ্যাস বেরোয়; (বিজ্ঞান সে গ্যাসের নাম দিয়েছে কারবন্ মনোক্সাইড্) সেই গ্যাস (gas) রাজপুত্তুর নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছে, তা'তেই হ'য়েছে রাজপুত্তুরের মৃত্যু।

—কিন্তু স্বপনপুরীর রাজকন্যার কি হ'ল তা'ত ব'ললে না?

—হ্যাঁ; তিনি তখন রাজপুত্তুরের সোনারকাঠির স্পর্শের (Oxygen) এর অভাবে দিনের পর দিন ঘুমিয়ে চললেন;

সে ঘুম তাঁর আর ভাঙল না ; কারণ তিনি অক্‌সিজেন্‌ (oxygen) গ্যাসের অভাবে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছিলেন মাত্র ; রাজপুত্তুর এসে সেই গ্যাস তাঁর নাকের কাছে ধরলেই তিনি বেঁচে উঠতেন। আমরাও সর্ব্বদা নিঃশ্বাসের সঙ্গে অক্‌সিজেন টেনে নিচ্ছি ; এর অভাব হ'লে আমাদেরও রাজকন্যার মত অবস্থা হবে। আমরা আবার যেটা ছেড়ে দিচ্ছি, তার নাম (Carbon dioxide) কারবন ডায়ক্‌সাইড্‌ ; সেটা গাছেরা টেনে নিয়ে আমাদের বিষাক্ত গ্যাস থেকে মুক্তি দিচ্ছে।

দেখলাম ; মিণ্টুর চোখদু'টি বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছে ; আর এদিকে প্রভুভক্ত ভৃত্য, হরিচরণ বৈকালিক চা-জলখাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কোনও রেল-কোম্পানীর আমি লাইন ইন্‌স্পেক্টার। সহকর্ম্মী হিসেবে শিকারী টমসন সাহেবের সঙ্গে আমার ছিল গলাগলি ভাব। তাঁর সঙ্গে আমি অনেকবার শিকারে বেরিয়েছিলাম। তাঁর মত ভাল শিকারী আমি জীবনে কমই দেখেছি। যেমনি ছিল তাঁর সাহস, তেমনি অব্যর্থ লক্ষ্য। তাঁর সঙ্গে থেকে শিকারে আমারও সখ জেগেছিল।

দুজনে ট্রলীতে চ'ড়ে লাইন দেখতে বেরুতাম; সঙ্গে থাকত বন্দুক, আর শিকারের যাবতীয় সরঞ্জাম। পথে কোথাও কোনও ভাল শিকারের সন্ধান পেলে অমনি দুজনে ছুটতাম। এমনি এক শিকারের কথাই আজ তোমাদের বলব।

এক ছোট স্টেশনের নিকটে সেবার লাইন মেরামত চ'লছিল। জায়গাটা জঙ্গলময়, দুপাশে পাহাড়। মোট কথা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল তার খুবই সুন্দর। লাইন মেরামতের কাজ দেখবার জন্য

মাইল পনের দূরের জংসন ষ্টেশন থেকে আমাকে ও মিঃ টমসনকে প্রায় রোজই ট্রলীতে বেরুতে হ'ত। কিন্তু লাইন পরিদর্শন ছাড়াও আমাদের মনে ছিল শিকারের নেশা। এমন যে জঙ্গল ও পাহাড়ময় জায়গা, সেখানে শিকারও বোধ হয় মিলবে ভালই, এই আশা নিয়েই রোজ বেরুতাম, কিন্তু কাজের চাপে কয়েকদিন সুযোগ হ'য়ে ওঠেনি। একদিন কোনও কাজে হঠাৎ জংসনে দেরী হ'য়ে যাওয়ায়, সকালে না পৌঁছে, লাইন মেরামতের জায়গায় পৌঁছালাম বিকেলে। পৌঁছে দেখলাম, কুলীদের মুখে চোখে উদ্বেগের চিহ্ন, কাজেও যেন তেমন মনোযোগ নেই। আমাদের তারা বললে—হুজুর! বাঘ।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম—বাঘ? কোথায়?

তারা বললে—নিকটের ওই পাহাড়ের নীচে হুজুর, খুব বড় বাঘ। গাঁয়ের লোক অনেকে দেখেছে। একটা মোষও তুলে নিয়ে গেছে গাঁ থেকে।

শিকারী টমসনের মুখের দিকে তাকালাম : সমস্ত মুখখানায় আনন্দের চিহ্ন! চোখ দিয়ে হাসি খেলে যাচ্ছে।

সাহেব আমাকে ইংরেজীতে ব'ললে—বাবু! জব্বর শিকার; যাবে তুমি? ভয় ক'রবে না ত'?

টমসনের কথায় একটু দুঃখ পেলাম! যথাসম্ভব ছাতি ফুলিয়ে টমসনকে ব'ললাম—সাহেব! তুমি আমাকে কোনদিন ভয় করতে দেখেছ'? এতদিন ত' তোমার সঙ্গে মিশছি।

সাহেব হেসে ব'লল—বাবু! আমি সেজন্যে বলছি না। পৃথিবীতে আমার নিজের ব'লতে কেউ নেই; সেইজন্যেই প্রাণের বিষয়ে আমি বেপরোয়া; কিন্তু তোমার ছেলে-মেয়েরা তোমার মুখের পানেই চেয়ে আছে।

টমসনের স্নেহমাখা কথাগুলো শুনে তার দৃঢ় বলিষ্ঠ বুকখানার পানে তাকালাম এই দেখতে যে, শিকারীর পাথুরে বুকটার কোনখানে এমন একটা কোমল প্রাণ আছে।

টমসন কথা ব'লল--বাবু! তা'হলে আজকের মত কাজ বন্ধ করতে হুকুম দাও। কুলীরা লাঠি ইত্যাদি নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলুক্। তারা বাঘকে তাড়িয়ে আনবে, আর আমরা দুজনে গুলী করবো। আর দেরী নয়, শীগ্‌গির চলো, সন্ধ্যে প্রায় হ'য়ে এল।

কুলীদের নিয়ে বেরিয়ে প'ড়লাম; দুজনের হাতে দুটো বন্দুক। গুলী রাখবার বেল্টে ভর্ত্তি টোটা। আমরা দুজনে চলেছি, সামনে; আর কুলীরা লাঠি, টাঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে পিছনে হল্লা করতে করতে চলেছে।

সন্ধ্যে হ'তে আর দেরী নেই; সূর্য্য ডুবে গেছে। অন্ধকারও ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। কুলীদের কাছ থেকে আমার ইলেক্‌ট্রিক-টর্চ্চটা চেয়ে পকেটে নিলাম। সামনেই জঙ্গল। সেখান থেকেই জমিটা ক্রমশঃ উঁচু হয়েছে। পাশেই পাহাড়। এখানেও ধানের জমি। ধানের সময় নয়; শূন্য ক্ষেত। একটা আল থেকে আর একটা আলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছি। হঠাৎ

টমসন্ একটা আল থেকে নীচে পড়েই আর্ত্তনাদ করে উঠল। ভাবলাম, হয়ত হোঁচট খেয়ে সাহেব পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে। নীচে লাফিয়ে পড়বার আগে যা' দেখলাম, তাতে গায়ের রক্ত জল হ'য়ে গেল। দেখলাম, টমসন একেবারে দুযমনের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ ক'রছে।

চীৎকার করে উঠলাম, কুলীদের উদ্দেশে। কুলীরা হয়ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আগেই সরে পড়ে ছিল। মুহূর্ত্তের জন্য আমিও হতভম্ব হয়ে প'ড়লাম। কিন্তু চোখের সামনে বন্ধু টমসনের বিপদ দেখে চুপ করে থাকতে পারলাম না।

সাহেব লড়তে লড়তে সঙ্কেত ক'রল—বাবু! গুলী ক'রো না; গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে আমার গায়েও এসে লাগতে পারে।

সাহেব ক্রমশঃ অবসন্ন হ'য়ে প'ড়ছিল। বাঘ, তার পিঠের জামাটা কামড়ে তাকে শূন্যে তুলে ধরতেই আমার মাথায় রক্ত চেপে গেল। সাহেবের অনুরোধ উপেক্ষা করে, গুলী ছুঁড়লাম। গুলী বাঘের গায়ে লাগল; কিন্তু যেস্থান লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছিলাম, সেখানে নয়; গিয়ে লাগল পিঠে। বাঘ সাহেবকে ছেড়ে দিয়ে একবার গর্জ্জন ক'রল; তারপর একলাফে আমার ঘাড়েব ওপর এসে প'ড়ল। আমার তখনকার মনের অবস্থা আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না। প্রকাণ্ড বাঘ তার বড় বড় নখ দিয়ে আমার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত করে তুলছিল। পিছন

ফিরে একবার টমসনের পানে তাকাবার চেষ্টা করলাম। দেখলাম, সে মাটী থেকে উঠে নিজের বন্দুকটা তুলে নিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার বন্দুক গর্জ্জন করে উঠল। যে টমসনের গুলী কোনদিন ব্যর্থ হ'তে দেখিনি, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তার গুলী

তারপর একলাফে আমার ঘাড়ের ওপর এসে প'ড়ল

সেদিন ব্যর্থ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘ আমাকে ছেড়ে, একলাফে তার ঘাড়ে গিয়ে প'ড়ল। আমি কর্ত্তব্য স্থির করে নেবার পূর্ব্বেই বাঘটা সাহেবকে তুলে অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিল। টর্চ্চের আলো ফেললাম চারিদিকে, বন্দুকের আওয়াজ করলাম; কিন্তু সাহেবের সন্ধান মিলল না।

অগত্যা আমি লাইনের কাছে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। সেখানে কুলীরা সমবেত হ'য়ে জটলা ক'রছিল। আমি ভীরুতার জন্য তাদের গালাগালি করতে লাগলাম। কিন্তু গালাগালি ক'রবার তখন সময় নেই ; সাহেবের খোঁজে বেরুতে হবে। দেরী করা মানে টমসনের জীবন নিয়ে খেলা। বাঘের হাত থেকে যদিও তাকে বাঁচাবার আশা থাকে, দেরী ক'রলে সে আশাও ছাড়তে হবে। কুলীদের আবার নূতন করে উৎসাহিত ক'রে তুললাম। এমনও ভয় দেখাতে বাধ্য হ'লাম তাদের, বাঘে সাহেবকে তুলে নিয়ে গেছে, তাকে না ফিরিয়ে আনতে পারলে কি হবে জানিস ? ওপরওয়ালারা ভাববে, তোরাই তাকে টাকার লোভে খুন করেছিস্। বাঁচতে চাস্ ত' চল্, শীগ্গীর চল।

তারা সকলে শিউরে উঠল। তারপর টাঙ্গি বল্লম এবং নিজের নিজের অস্ত্র গোছাতে লাগল।

ইতিমধ্যে আমি লোক পাঠিয়ে ষ্টেশন থেকে জংসনে ফোন করলাম, দু' তিনজন শিকারী পাঠাতে। দুজন কুলীকে ক্যাম্পে রেখে গেলাম, শিকারীদের পথ দেখিয়ে জঙ্গলের ভেতর নিয়ে যাবার জন্য। তারপর বেরিয়ে পড়লাম।

লাইন থেকে মাইল দুই দূরে, জঙ্গলের ভেতর একটা জলার সামনে কুলীরা মাচা তৈরী ক'রলে। আমি উঠে ব'সলাম, মাচার ওপর, খাবার, জল আর বন্দুক নিয়ে। আর কুলীরা জলার কাছাকাছি একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত ক'রে, তার ওপর কাঠকুটো

দিয়ে গর্ত্তটাকে ঢেকে দিলে এবং ওপরে রেখে দিল একটা মরা ছাগল।

তখন আমাদের মনের অবস্থা সাংঘাতিক। সারারাত ঐ ভাবে কেটে গেল। সকালে এসে পৌছল, তিনজন শিকারী। সেই সঙ্গে আরও খাবার, আরও জল। মনে সাহস হ'ল। সারাদিন হল্লা করে আর বাঘের পায়ের দাগ দেখে কাটল। সন্ধ্যে হ'তেই আমি উঠলাম মাচায়; তিনজন শিকারী তিনপাশের তিনটে গাছে উঠলেন। আর কুলীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কোন্‌দিকে লুকিয়ে থাকল জানি না।

রাত্রির অন্ধকারে এমনি ভাবে চুপ্‌চাপ্‌ বসে বাঘের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। আজ রাত্রে বাঘ আসবে-না নাকি? এমনি কত কথা ভাবছিলাম। হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রাত একটা। চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছিল, ঠিক এমনি সময় নিস্তব্ধ প্রকৃতিকে চকিত করে বন কাঁপিয়ে একটা গর্জ্জন শোনা গেল। কিছুদূর থেকে শিকারীরা সকলে আস্তে আস্তে ব'ললে—Ready—বন্দুক বাগিয়ে ব'সলাম। ঘড়ি দেখছি, পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরা মিনিট, কিন্তু বাঘ আর আসে না। টের পেয়েছিল নাকি সেই জানে। চোখগুলো আবার ঝিমিয়ে আসছিল। ঠিক এমনি সময় নিকটে আবার গর্জ্জন শুনতে পেলাম।

মনে মনে ভাবলাম—শয়তান! আজ তোমার শেষ! টমসন্

কোথায় আমরা জানি না ; সে কি আর বেঁচে আছে ? আজ তোমায় শেষ করে টমসনের শব অন্ততঃ খুজে বার করতে হবে।

অন্ধকার আর নিস্তব্ধতাকে বিদ্রূপ করে বাঘ এল অত্যন্ত সন্তর্পণে চোরের মত পা ফেলে ফেলে। চারিদিকে তার সতর্ক

অত্যন্ত সন্তর্পণে চোরের মত পা ফেলে ফেলে

দৃষ্টি। অন্ধকারে দুটি জ্বলন্ত চোখ ছাড়া আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

কুলীদের বলা ছিল, গুলী করার পর বাঘ যদি আহত অবস্থায় পালাবার চেষ্টা করে, তবেই যেন তারা বাঘকে ঘিরে, বল্লম দিয়ে গেঁথে ফেলে। না হ'লে, যেন বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে আসে না।

বাঘ চতুর। সে বুঝতে পেরেছিল, ছাগলটার নীচে মাটিতে প্রকাণ্ড গর্ত্ত। তাই সে একলাফে মুখ নীচু করে ছাগলকে তুলবার চেষ্টা করল ঃ কিন্তু কৃতকার্য্য না হ'য়ে একেবারে গর্ত্ত পার হ'য়ে ওপাশে গিয়ে প'ড়ল। রাগে সে গর্জ্জন করে উঠল আর একবার। আমার বুকের ভেতর তখন হাতুড়ি পিটছে। বাঘটা আবার লাফ দিলে। কিন্তু রাগের জন্যই হয়ত গর্ত্তের কাঠগুলোর ওপর এসে পড়ল। বাঘের ভারে কাঠগুলো ভেঙ্গে বাঘকে নিয়েই গর্ত্তে পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে আমাদের চারটে বন্দুক থেকে একসঙ্গে গুলী বেরিয়ে গেল। একটা আর্ত্তনাদ ক'রে বাঘ গর্ত্তের ভেতর পড়ে গেল। আমরা সকলে গাছ ও মাচা থেকে নামলাম, কুলীরা হল্লা করতে করতে ছুটে এল বল্লম ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। গর্ত্তের ভেতর আলো ফেলে দেখলাম, রক্তাক্ত-কলেবরে বাঘটা ম'রে গর্ত্তের মধ্যে পড়ে আছে। প্রকাণ্ড বাঘ। কুলীরা সেটাকে গর্ত্ত থেকে তুলে বাঁশে ঝুলিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চ'লল। আমরা চীৎকার করতে করতে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে টর্চ্চের আলো ফেলে এগিয়ে চ'ললাম। হঠাৎ পাহাড়ের কাছে আসতেই একজন শিকারী চীৎকার করে উঠল Here it is—নিকটে গিয়ে দেখলাম, টুপি ; তার ওপরে টমসনের নামাঙ্কিত ব্যাজ। 'খোঁজ, খোঁজ' সাড়া পড়ে গেল। এপাশে ওপাশে লক্ষ্য করতেই চোখে প'ড়ল, পাহাড়ের গায়ে একটা গহ্বর। বুঝলাম, টমসন্ বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছে, আমি চিরদিনের জন্য

হারিয়েছি বন্ধু টমসনকে। চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠল। মনে হ'ল আমার, বাঘটাকে একেবারে প্রাণে মেরে ঠিকমত প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি; উদ্‌ভ্রান্তের মত একটা বল্লম দিয়ে মরা বাঘটার শরীর ক্ষত বিক্ষত ক'রে তুললাম। কিন্তু বাঘ যে আমাকে ছুঁয়েছিল, তার আঠারো-ঘা সারতে আমার অনেক দিন লেগেছিল।
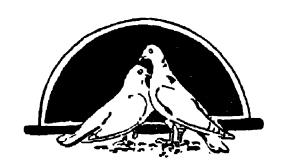
জমিদারের বাড়ীর ছেলেমন্থেষ চাকর ছিল, রম্না; বাপ-মা মরা ছেলে। বছর এগারো বয়স; ফুট্‌ফুটে তা'র গায়ের রং। বাপ-মা আদর ক'রে নাম রেখেছিল, রমন; সে নাম আজ সবাই ভুলে গেছে। বাপ, মা মারা যাবার পর অন্য উপায় না দেখে সে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রলো; একদিন পথে ভিক্ষে ক'রতে ক'রতে সে, জমিদারের 'মাষ্টার-বুইক্' গাড়ীর সামনে হাত পেতে দাঁড়ালো; মুখে তার সেই কাতর আবেদন—গরীবকে একটা পয়সা দাও বাবা; ভগবান্ তোমার মঙ্গল ক'রবেন! ফুট্‌ফুটে ছোট ছেলেটিকে দেখে, জমিদারের মনে সেদিন স্নেহ জেগেছিল; নিরন্ন দুঃখীর প্রতি, ধনীর সহানুভূতি! তবু জমিদার তিনি; দাম্ভিক না হ'লে

তাঁদের চলে না। তাই, তাচ্ছিল্য ভরেই জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন—কিরে ছোঁড়া, খেটে খেতে পারিস্ না? কি নাম তোর; কি জাত? তেমনি অনুনয়ের স্বরেই রম্না জবাব দিয়েছিল—আমার নাম বাবু, রমন; জাতে আমি চাষা। আমাকে কাজ দেবেন বাবু? তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো আশার আলো।

জমিদারবাবু গম্ভীর হ'য়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর ব'ললেন—আচ্ছা, উঠে ব'স্ গাড়ীতে। রম্না তাড়াতাড়ি তার ভিক্ষে ক'রবার ভাঙ্গাবাটিটা বুকে চেপে গাড়ীর পা-রাখবার-জায়গায় উঠে ব'সলো।

সেই থেকে রম্না, জমিদারের বাড়ীতে ছেলে-ভোলানো চাকরি পেয়ে গেছে। সে আজ দু'বছর আগের কথা। জমিদার বাবুর মধুর রম্না সম্বোধনেই সে আজ সকলের কাছে পরিচিত; তা'র বাপ-মা'র দেওয়া আদরের নামটা, আজ হয়ত' অন্য সকলের মত, তা'র নিজেরও মনে নেই।

যত সহজে রম্ণা তা'র চাকরিটা জুটিয়ে নিয়েছিল, ততটা নির্ব্বিঘ্নে দু'টো বছর তার কাটেনি। অপমান, লাঞ্ছনা, মারধর, এই দুটো বছরে, বিনা কারণে সে অনেকই সহ্য ক'রেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেয়েছে, স্থির নিশ্চল হ'য়ে; চোখ দিয়ে ঝরে গেছে, অশ্রুর বন্যা; তবু রম্না প্রতিবাদ করেনি।···কোনও জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে না, ধর বাচ্চা নূতন চাকর রম্নাকে; কিছু ভেঙ্গে গেছে, ঠাকুর-চাকরেরা রম্নাকে দেখিয়ে দেয়; রম্না কিন্তু চুপ ক'রে

থাকে। ছোটছেলে, বোঝেও না যে, এ যুগে চুপ্‌ ক'রে থাকার মানে, দোষ মেনে নেওয়া!···শেষে হয়ত' হারানো জিনিষ ঘর থেকে অথবা গৃহিণীর বাক্‌স থেকেই বেরোয়, জিনিষ-ভাঙ্গা প্রকৃত অপরাধীও ধরা পড়ে; কিন্তু ততক্ষণে জমিদারের জুতোর অথবা ছড়ির কয়েক ঘা, নির্ম্মমভাবেই রম্‌নার পিঠের ওপর বর্ষিত হ'য়েছে।

এমনি একটা দিনের ঘটনায় আবার রম্‌নার জীবনটা কেমনভাবে ছন্নছাড়া হ'য়ে গেল, সেই কথাই আজ আমি তোমাদের ব'লবো :

···জমিদারের ছোটছেলেটীর ওপর মায়া ব'সে গেছে, রম্‌নার। হরদম্‌ তা'কে কোলে নিয়ে ঘোরে; কতরকমভাবে তা'কে ভুলিয়ে রাখে, খেলায়। খোকাটাও ভালবাসে রম্‌নাকে। সে, রম্‌না ছাড়া আর কারু হাতে দুধ খাবে না, কারু হাতে নাইবে না; এমন কি, রম্‌না ঘুম পাড়িয়ে না দিলে সে ঘুমুবেও না।···সেদিন বিকেলবেলাও অন্যদিনের মতই রম্‌না খোকাকে বাইরের বারান্দায় ব'সে খেলাচ্ছিল; তা'কে ব'লছিল, রাজপুত্তুরের গল্প, পক্ষীরাজ ঘোড়ার গল্প। এমন সময়, ছেলেমানুষের মন; খোকন ফস্‌ ক'রে প্রশ্ন ক'রে বসে—আমার যেমন মা আছে; তোমার তেমনি মা নেই রম্‌না?

রম্‌নার চোখদু'টি ছল্‌ ছলিয়ে ওঠে; ধরাগলায় জবাব দেয়—না খোকা ভাই; আমার মা ম'রে গেছে!

—কোথায় গেছে তোমার মা? আধ আধ স্বরে খোকা আবার শুধায়।

আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে রম্‌না দেখিয়ে দেয়—ওই ওখানে খোকা ভাই!

খোকা কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে, তারপর আবার প্রশ্ন করে—আর, তোমার বাবা? তিনিও ত' তোমাকে কিছু খেলনা এনে দেন না; আদর ক'রে একবার দেখতেও আসেন না! কেঁদে ফেলে রম্‌না; দু'চোখে অশ্রু-বন্যা ব'য়ে যায়; দু'টি গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। রম্‌না বলে—আমার বাবাও ম'রে গেছে খোকা-ভাই; সেও চ'লে গেছে ওই আকাশে। গল্পের মত ক'রে খোকাকে তা'র দুঃখের কাহিনী শোনাতে থাকে রম্‌না; বলে—যখন সন্ধ্যে হয় খোকা-ভাই; তোমরা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়'; আমার মা-বাবা তখন আকাশের তারা হ'য়ে আমার দিকে চেয়ে থাকে।…বাতাসের ভেতর আমি যেন তা'দের মুখের কথা শুনতে পাই; আমার মনে হয়, আমার মা-বাবা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে; আমিও একদিন বাবা-মা'র কাছে চ'লে যাবো খোকা-ভাই!

রম্‌নার গল্প বলা শেষ হ'লে খোকা যেন কী ভাবতে থাকে; তা'র উজ্জ্বল চোখ দু'টোও ছল্‌-ছলিয়ে ওঠে। গলার হারটা খুলে খোকন বলে—তুমি কেঁদনা রম্‌না, এটা তুমি নাও; আমি এটা তোমাকে এক্কেবারে দিয়ে দিলাম। দুঃখের মাঝেও হেসে ফেলে রম্‌না। না নিলে পাছে খোকা-বাবুর মনে দুঃখ হয়, সেই ভেবে সে হাতপেতে হারছড়া নিলে! একটু পরে ফিরিয়ে দেবে, এই ছিল তা'র ইচ্ছা।…

কিন্তু ভুল ; মনের ভুলে মানুষ কত সময় কত কাজ ক'রে ফেলে ; তা'র জন্যে দোষ ধরা উচিৎ নয়। হঠাৎ ভেতরে খোকার ডাক পড়'লো, আর রম্‌নাকে পাঠানো হ'ল বাজারে। কাপড়ের খুঁটে বাঁধা, হারগাছার কথা রম্‌নার মনেই ছিল না মোটে।

বাজার থেকে রম্‌না যখন ফিরলো, বাড়ীতে তখন হুলুস্থুল ব্যাপার ; জমিদারের ছেলের গলার-হার পাওয়া যাচ্ছে না ; একটাকা ছু'টাকার জিনিষ নয়,—চুনিপান্না মুক্তা বসানো মূল্যবান্ সোণার হার ! হারানোর সঙ্গে সঙ্গে রম্‌নার খোঁজ প'ড়ে গেছে ; সেই ছেলে নিয়ে থাকে ; তাছাড়া বাচ্চা চাকর ; এসব দিকে নাকি তা'রা এক্সপার্ট হয়। সকলে ভেবেছিল, বাজারে যাবার নাম ক'রে হার নিয়ে রম্‌না সট্‌কে প'ড়েছে। পুলিসে খবর পাঠাবার কথা হ'চ্ছিলো, এমন সময় রম্‌না এসে দাঁড়ালো উঠোনে। বাড়ীর সকলকে হঠাৎ উত্তেজিত দেখেই তা'র, খোকার দেওয়া হার-গাছার কথা মনে প'ড়ে গেল। মুখ ফুটে সে কিছু ব'লতেও পারলো না ; সে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল। আজ কী ব'লবে সে ? কেইবা বিশ্বাস ক'রবে তা'র কথা ; তার কাপড়ের খুঁটেই যে হারগাছা বাঁধা রয়েছে !

তার যখন এমনি অবস্থা, এমন সময় হঠাৎ জমিদার তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে ধরলেন। মুখে তাঁর গালাগালির গোলাবর্ষণ হচ্ছিল,—চোর ! বদ্‌মাইস ; স্কাউণ্ড্রেল্ ! বের কর্ কোথায় হার রেখেছিস্ ! সেই সাথে সমানে চলেছিল, কিল, চড়,

ঘুসি। কেঁদে ফেললো রম্‌না; আজ সে মৃদুস্বরে ব'ললো—

খোকন ভাই! খোকন-ভাই রাখতে দিয়েছিল আমাকে। সেই সঙ্গে সে হারটা নিজের কাপড়ের খুঁটথেকে খুলে জমিদারের হাতে দিল। গর্জ্জন ক'রে উঠলো ক্রুদ্ধ জমিদার; সেই সাথে অন্য সকলেও;—খোকন-ভাই! খোকন হার রাখতে দেবার লোক পায়নি, ওকে রাখতে দিয়েছে! চোর, রাস্‌কেল্‌, শীগ্‌গির বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে; নইলে পুলিসে দেবো!

আর কোন কথাই ব'ললো না রম্না ; ধীরে ধীরে কোণের দিকে আগিয়ে গিয়ে তা'র শোবার ঘর থেকে, তা'র বহুদিনের পরিত্যক্ত ভিক্ষে ক'রবার বাটীটা শুধু তুলে নিল ; তা'র দু'টো বছরের কাজ করার মাইনের টাকাও চেয়ে নিল না। একবার ঘুমন্ত খোকনের দিকে স্নেহভরে তাকিয়ে পথে নেমে এলো ; কলকাতার পথে পথে তখন আলোকমালা জ্ব'লে উঠেছে।

…তারপর, দিন যায়। রম্না আজও ভিক্ষে মাগে। যদি কলেজষ্ট্রিটের ফুটপাত দিয়ে কোনদিন পেরিয়ে যাও, দেখবে একটি ছোট ছেলে করুণস্বরে পথিকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে, —গরীবকে একটা পয়সা দাও বাবা ! ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করবেন। তোমরা তা'কে চিনে একটা পয়সা দিও ; ও আমাদের বাপ-মা মরা, দুঃখী রম্না।…

পথ হাঁটতে হাঁটতে সমীর বলে : রাস্তায় কি রকম কাদা দেখছিস্ ; হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবে যাচ্ছে।

জ্যোতিষ উত্তর দেয় : এর জন্যে ত আর কারুকে দোষী করা যায় না ভাই ; দোষ আমাদের ; শহরের মোহে প'ড়ে আমরা গাঁয়ের মায়া কাটিয়েছি, বৎসরান্তে একবার, তাও আসি না, আমাদের গাঁয়ের দুর্দ্দশা তাই এত !

সুধীর বলে—পথ হাঁটায় খিদে পেয়ে গেছে কিন্তু ; আমাদের থলিতে কিছু আছে আর ?

একটা গাছের নীচে ব'সে তারা খাবারের থলি খুলে বসে; খবরের কাগজ একখানা মাটিতে মেলে তার ওপরে খাবারগুলো ঢালা হয়; খাবার যা আছে তা অতগুলি ছেলের পেটভরার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবু একটু জলযোগ ত করা যাবে। খানিক পরেই গ্রামেও পৌঁছে যাবে তারা। ঠিক যখন তা'রা খেতে সুরু করবে সেই সময় একটি শীর্ণ বুড়োলোক সামনে এসে দাঁড়াল; সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে খাবারগুলোর পানে তাকিয়ে বললে—আজ তিনদিন কিছু খাইনি বাবা; আমাকে কিছু খেতে দাও!

হাতের গ্রাস হাতেই থেকে যায়, তাদের মুখে আর ওঠে না। সুরেশ প্রশ্ন করে—তিনদিন খেতে পাওনি কেন?

ভিক্ষুক বলে—গাঁয়ে যে দু'বছর অজন্মা বাবা! দুর্ভিক্ষ হয়েছে তাই।

শহরের আবহাওয়ার মধ্যে এরা মানুষ; তাই জানেনা গাঁয়ের লোকেরা কতদুঃখ সহ্য করে বেঁচে থাকে। অজন্মা আছে, অসুখ আছে, আরও কত কি তাদের সুখের পথে বাধা দেয়। বইয়ে পড়েছে বটে এরা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের শোচনীয় ইতিহাস। আজ স্বচক্ষে তারা দেখতে পেল, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট কঙ্কালসার একটি মানুষকে। আর তাদের খাওয়া হল না, খাবার সুদ্ধ কাগজটি ধ'রে দিল ক্ষুধার্ত্ত লোকটির হাতে। তারপর হাসিমুখে উঠে পথ চলতে সুরু করে। সুরেশ গান ধরে—

"আমারা বাংলা মায়ের ছেলে—
দুঃখ মোরা করবো বরণ সুখের নেশা ফেলে।"

এরা স্কুলের ক'জন স্কাউট। কয়েক দিনের ছুটি পেয়ে গাঁয়ের এবং পথের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করবার জন্যে এরা বেরিয়েছে। কোথায় যাবে, কতদূর যাবে তার কোনও স্থিরতা নেই। তবে যে পথ দিয়ে তারা হেঁটে চলেছে, সেইপথে সমীরদের গ্রাম পড়ে। সেখানে একটা দিন কাটিয়ে যাবে, এই তাদের ইচ্ছা। যে পথে তারা চলেছে সে জায়গাটা বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে পড়ে। বর্দ্ধমান জেলায় সেবার অতি বৃষ্টি হয়ে সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। করালমূর্ত্তি ধরেছিল দামোদর নদ। তোমাদের মধ্যে যারা কাগজ পড়, তারা জানো, বন্যায় সেবার কতগ্রাম ধ্বসে গিয়েছিল; কত ক্ষতি হয়েছিল বন্যার জলে। এরা বেরিয়েছে সেই বন্যার আগের দিন।

গাঁয়ে যখন তারা পৌঁছলো, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টিতে সকলেরই জামা প্যাণ্ট ভিজে গেছে। পথের কাদায় জুতোর আকার ডবল হ'য়ে গেছে। তাছাড়া ষ্টেশন থেকে ন'দশ মাইল হেঁটে আসায় শরীরও খুব ক্লান্ত। জামা-জুতো খুলে ফেলে এরা পা ধুচ্ছে, এমন সময় বাইরে থেকে বহু কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শোনা গেল—"বান আসছে—বান আসছে······"

সমীর, জ্যোতিষ প্রভৃতি ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাইরে। একজন লোককে জিজ্ঞাসা করলে—ব্যাপার কি ?

লোকটি বললে গ্রাম থেকে মাইল আষ্টেক দূরে দামোদরে যে বাঁধ দেওয়া ছিল, জলের স্রোতে তা' ভেঙে গেছে এবং সেই ভাঙা জায়গার ভেতর দিয়ে বানের জল নাকি দ্রুতগতিতে গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। হয়ত সকালের মধ্যেই জল গ্রামে ঢুকবে।

সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনে নিয়ে এরা মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির করে ফেললে। সমীর বিউগিল ফুঁ দিয়ে সমস্ত গ্রামকে চকিত করে তুললে! গাঁয়ের যে যেখানে ছিল বিউগিলের শব্দে ব্যাপার কি জানবার জন্যে ছুটে এল; অল্পক্ষণের মধ্যেই জনশূন্য স্থানটি লোকে ভর্ত্তি হ'য়ে গেল। বাড়ির দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে গ্রামবাসীদের উদ্দেশ ক'রে জ্যোতিষ বলে চললো—দেখুন, এই গ্রাম থেকে আট মাইল দূরে নদীর বাঁধ জলের স্রোতে ভেঙে গেছে; বানের জল সেই জায়গা দিয়ে হু হু শব্দে চারিদিক ডুবিয়ে দিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে; হয়ত শীগ্‌গির গ্রাম ভাসিয়ে দেবে। তার আগে আপনাদের সতর্ক হওয়া দরকার। আপনারা নিজের নিজের মূল্যবান্ এবং দরকারী জিনিসপত্তর ও গোরু-বাছুর ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে উঁচু জায়গা অথবা পাকাবাড়ির দোতলার ছাদে আশ্রয় নিন। জিনিসপত্তর সরাতে আমরা আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবো।

গ্রামবাসীরা জিনিষপত্তর সরাবার জন্যে নিজেদের বাড়ির পানে ছুটলো। এরাও গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে গ্রামবাসীদের সাহায্য করতে লাগলো, নানাপ্রকারে।

সারারাত তাদের ঘুরে ঘুরে কাটলো ; বান এলনা রাত্রে। ভোরে সকলে ভাবলে, বুঝি ভগবান সদয় হ'য়েছেন ; বানের জল হয়ত ফিরে গেছে নদীতে। কিন্তু একটু পরেই চারদিক থেকে একটি সোঁ সোঁ শব্দে গ্রামবাসীরা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। স্কাউটরা

ছাদের ওপর উঠে দেখলে, চারিদিকের দিক্‌চক্রবাল হ'তে পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউ গ্রামের দিকে ছুটে আসছে ; এক্ষুনি সমস্ত গ্রাম-খানাকে যেন গ্রাস করে ফেলবে। বাংলার তরুণেরা নদীর এ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে ভয় পেল না ; যদিও তা'রা জানতো গ্রামে বান ঢুকলে, অন্য সকলের মতই তাদেরও জীবন সঙ্কটাপন্ন !

ব'সে থাকবার সময় নেই; চারিদিক থেকে বন্যার গর্জ্জনের সঙ্গে সুর মিশিয়ে শত শত নরনারীর ভয়ার্ত্ত আর্ত্তনাদ এদের প্রাণকে ব্যথিত করে তুলল; বান তখন গ্রামে ঢুকতে সুরু হ'য়েছে; সমস্ত জায়গায় একহাঁটু করে জল। জল বেড়েই চলেছে; খানিক পরেই হয়ত একমানুষ জলের নীচে গ্রাম ডুবে থাকবে। কিন্তু তার জন্যে ত ভয় পেয়ে এরা ঘরে বসে থাকতে পারে না; কে কোথায় সাহায্যের জন্যে আর্ত্তনাদ করছে এই দেখবার জন্যে জল কেটে কেটে তারা ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত গ্রামে একগলা জল জমে গেল; আর হেঁটে চলা যায় না। সকলে পাশাপাশি সাঁতার দিয়ে চ'ললো। একবার এক একজন চীৎকার করে ওঠে—সাবধান, সাপ!

বন্যার জলের সঙ্গে বড় বড় সাপ ভেসে আসছে: তা'দের একটা ছোবলই মানুষকে মেরে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। তখন বেলা আটটা কি ন'টা; এদের মনে হ'ল এতগুলো লোক যে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছে, তারা খাবে কি? সমীর, জ্যোতিষ প্রভৃতি সাঁতরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, পুকুরের উঁচু পাড়ে, যেখানে গ্রামের বেশিরভাগ লোক আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, আপনাদের সঙ্গে খাবার আছে ত'? গ্রামবাসীরা ম্লান হেসে, পুরানো কথারই প্রতিধ্বনি করল—গাঁয়ে দুর্ভিক্ষ; খাবার, টাকা-কড়ি কিছু নেই।

আবার প্রশ্ন করে তারা—এখানে খাবার কিনতে পাওয়া যাবে—কোথায়, বলতে পারেন ?

উৎসাহিত হয়ে তারা বলে—হ্যাঁ, এখান থেকে কিছুদূরেই হাট ; সে জায়গাটা খুব উঁচু ; সম্ভবতঃ বান যেতে পারেনি ; সেই হাটে খাবার কিনতে পাওয়া যায়।

আবার স্কাউটরা সাঁতরে সাঁতরে হাটের দিকে রওনা হ'লো ; চারজনের কাছে শেষ সম্বল পঞ্চাশটি টাকা, তার থেকে কিছু দিয়ে কিনলে খাবার। চারটে লাঠি দিয়ে, দড়ির সাহায্যে একটা চার-কোণা ফ্রেম তৈরী ক'রে তা'তে খাবার-ভর্ত্তি মাটির খোলাটা বেঁধে নিল। এবং জলে নেমে, খোলাটাকে ঠেলে নিয়ে সাঁতরে চ'ললো গ্রামবাসীদের আশ্রয়ের পানে। সেই খাবার তারা নিরাপদ স্থানগুলিতে, গ্রামবাসীদের আশ্রয়ে আশ্রয়ে বিলি করলে, নিরন্ন বুভুক্ষুর দল তাদের জানালে আশীষ শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

দু'তিনদিন পর বান নদীতে নেমে গেল ; তখনও এদের কাজ ফুরোয়নি ; গৃহহীনদের ক্যাম্প খাটিয়ে দেওয়া, ক্ষুধার্ত্তদের অন্ন দেওয়া ইত্যাদি আরও কত কাজ তা'রা করে চলেছিল। শেষে যখন বান একেবারে সরে গেল ; তখন এরা রওনা হল শহরে ; বন্যাক্লিষ্টদের জন্যে অন্নবস্ত্র জোগাড় করতে।

গ্রাম থেকে স্টেশন পর্য্যন্ত হেঁটে আসতে তাদের দেরী হ'য়ে গেল। যদিও রেগুলারিটি স্কাউটদের কর্ত্তব্যের একটা প্রধান অঙ্গ, তবুও এমন এক একটা সময় প্রত্যেকেরই আসে, যখন

কর্ত্তব্যের বাঁধাধরা গণ্ডীও কোনও কারণে ছেড়ে যেতে হয়। এদের দেরী হওয়ার কারণও ছিল ; গ্রামের সমস্ত কাজ গুছিয়ে যখন তারা রওনা হল, সে সময়ে রওনা হয়ে ট্রেন ধরা কঠিন। কিন্তু সে ট্রেনে না গিয়েও উপায় নেই ; কাল যদি এরা শহর থেকে কিছু অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করে আনতে না পারে, তবে গ্রামবাসীদের উপোস দিতে হবে। তারা যখন ষ্টেশনে পৌঁছল তখন হুইস্‌ল্ পড়ে গেছে ট্রেন চলতে সুরু করেছে, প্লাট্‌ফর্ম ছেড়ে যায় যায় ; এমন সময় এরা ছুটতে ছুটতে এক এক করে চলন্ত ট্রেনেই উঠতে সুরু ক'রলে ; কিন্তু সুরেশের পায়ে ছিল, রবার-দেওয়া কেড্‌সের জুতো ; বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া ট্রেনের-পা-দানিতে পা গেল স্লিপ্ ক'রে ; এবং মিনিটখানেক হাতলটা ধরে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করতে করতে হাত ফস্‌কে সে ছিটকে গিয়ে পড়লো বাইরে লাইনের ধারে পাথরের উপর। মুহূর্ত্তেই কামরার মধ্যে জ্যোতিষ 'অ্যালার্ম সিগন্যাল্' ধরে ঝুলে পড়ল। ট্রেন থেমে গেল কিছুদূর আগিয়ে। এরা নেমে এল সুরেশের কাছে। পাথরের আঘাতে তা'র শরীর ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে গেছে, মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে। তুলে এনে এরা তাকে ট্রেনে চাপালে ; ক'রলে প্রাথমিক চিকিৎসা। তারপর হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দিয়ে গ্রামে ফিরে এল, প্রচুর খাবার বস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে। এরপর নানা জায়গা থেকে এসে পড়লো কত "রিলিফ্‌ওয়ার্কার্স" দল ; তা'রা ছোট ছোট ছেলেগুলিকে অনাবশ্যক মনে করে, সমস্ত কাজই নিয়ে নিল

নিজেদের হাতে। কাজ ফুরিয়ে গেছে দেখে এরা আর সেখানে বৃথা সময় না কাটিয়ে বাড়ি ফিরল। এমনি ক'রে আর্ত্তত্রাণে, লোকসেবায় তাদের ছুটির দিনগুলি সার্থক হ'ল।

'খুড়তুত', 'জেঠতুত', মামাত' ও 'পিসতুতো' ভাইবোন মিলে প্রায় জনকুড়ি তরুণ ছেলেমেয়ে সেবার জড় হয়েছিল চম্পাইনগর গ্রামে শিবচতুর্দ্দশীর মেলা উপলক্ষ্য ক'রে। তা'দের মধ্যে দুর্ব্বল, শীর্ণ কেউ নাই; জামার আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে পড়া মাংসপেশী-গুলোই তার প্রমাণ দেয়। তারা সবাই এসেছে শহর থেকে। সেখানে কেউ করেছে 'এনডিওরেন্স সাইক্লিং'এ নূতন রেকর্ড, কেউ নাম কিনেছে ভাল সাঁতারু ব'লে, কেউ দৌড়ঝাঁপে হ'য়েছে প্রথম, কেউবা ফার্ষ্টগ্রেড্ খেলোয়াড় নামে খ্যাত হ'য়েছে। এককথায় এরা ভবিষ্যতের সামাদ, প্রফুল্ল ঘোষ, বলাই চ্যাটার্জ্জী, গোষ্ঠপাল এমনি সব ভারতের মুখোজ্জ্বল করা ছেলে।

একসাথে যখন তারা গ্রামে বেরোয়, গ্রামের লোক হ'য়ে ওঠে সন্ত্রস্ত। গাঁয়ের ছেলেরা যথাসম্ভব দূরে থেকে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—'এরা শহরের পল্টন ; ভেক নিয়ে এসেছে ; গাঁয়ে লড়াই বাধবে শীগ্‌গিরই।' সত্যি কথা বলতে কি, এরূপ ভাবা তাদের পক্ষে বিচিত্র নয়। ম্যালেরিয়া যা'দের করে দিয়েছে কঙ্কালসার, অনাহারে বাঁচা যাদের পক্ষে মুস্কিল, তা'রা এদের মত সুগঠিত, বলিষ্ঠদেহ তরুণদের ও-ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। কিন্তু আসলে ছেলেরা গ্রামে লড়াই ত' বাধালেইনা, উপরন্তু উদ্যমের সহিত নিজেরাই ঝোপঝাড় পরিষ্কার করতে লেগে গেল। গ্রামের দু'চারজন মাতব্বর লোক বাধা দিয়ে বলেছিল—দেখ' বাছারা! এ গাছগুলি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের আমল থেকে আমাদের ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছে, ওদের বিনাশ ক'রে পাপের ভাগী হ'য়োনা।

গ্রামের অভিজ্ঞলোকদের কুসংস্কার দেখে এরা হেসে বলেছিল,—'এরাও ভিটে আঁকড়ে পড়ে থেকে মাটি থেকে রস টানুক্, আর ম্যালেরিয়াও রক্ত শুষুক্ আপনাদের শরীর থেকে ; কি বলুন ?'

এর পর গাঁয়ের লোক আর কথাটি বলেনি।

সেদিন রাত তখন প্রায় এগারোটা। খাওয়াদাওয়ার পর দোতলার ঘরে ঢালা বিছানায় এরা সকলে শুয়েছে। ঘুমও হয়তো এসেছে অনেকের চোখে, দু'একজন যাদের ঘুম আসেনি, তা'রা

শহরে যে মুক্ত আকাশ দেখতে পায়না তাকে আজ প্রাণ খুলে দেখছে। নীল আকাশে অসংখ্য তারা। গাছে গাছে জোনাকী জ্বলছে, মাটীতে অশ্রান্ত ঝিঁঝির শব্দ ঃ দূরে শোনা যাচ্ছে শেয়ালের চীৎকার।

জানালার পাশে শুয়ে নীতীশ তাকিয়েছিল বাইরের পানে। হঠাৎ সে চম্‌কে উঠে সুশান্তকে ব'ললো,—সুশান্ত! ঐ দূরের আকাশ রাঙা হ'য়ে উঠেছে ঃ আগুনের ফুল্‌কি উঠছে আকাশের দিকে ঃ কোথাও ঘরে আগুন লেগেছে বোধ হয়।

সুশান্ত একটা মুহূর্ত্ত তাকিয়ে নিলে নীতীশ নির্দ্দিষ্ট আকাশটার দিকে; পরমুহূর্ত্তেই পকেট থেকে স্কাউট হুইস্‌ল্‌ বের ক'রে মুখ লাগিয়ে তাতে ফুঁ দিলে জোরে। রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে হুইসিলের তীব্রশব্দ প্রতিধ্বনি তুলবার সঙ্গে সঙ্গেই এরা আলস্য ও তন্দ্রা ভেঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠেছে। সুশান্ত এদের মধ্যে বয়সে বড় এবং এদের লিডার; সকলের মনে প্রশ্ন জাগে, ব্যাপার কি? কিন্তু কেউ কোনও কথা জিজ্ঞেস করে না; পাছে discipline নষ্ট হয়; মানুষের প্রতিটি কাজে ডিসিপ্লিন্‌ না থাকলে গোলযোগ বাধবেই ঃ পৃথিবীতে এত বড় বড় যুদ্ধ সবই ডিসিপ্লিনের গণ্ডীতে বাঁধা ঃ না হ'লে সৈন্যদলে দেখা দিত অরাজকতা। যুদ্ধও এত সুন্দর ভাবে ও সুশৃঙ্খলায় হ'তে পারতোনা কিছুতেই।

সুশান্ত শুধু বলে—Ready, ঐ দেখ ওখানে ঘরে আগুন লেগেছে, চলো ওদিকে। ছুটলো আগুন লক্ষ্য করে সবাই।

পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি খড়ের ঘর; একটা অপরের সাথে কোলাকুলি করে দাঁড়িয়ে আছে ব'ললেও চলে। সেই জন্যেই একটাতে আগুন লাগার সাথেই পাশের আরও দুটো বাড়ীতে আগুন লেগেছে। হয়ত এইভাবে সমস্ত গ্রামখানা রাত্রের মধ্যে ধ্বংস হ'য়ে যাবে। এখানেও তাদের চোখে পড়ে গাঁয়ের লোকদের অনভিজ্ঞতা। অতি নিকটে বয়ে চলেছে দামোদর-মেন্-ক্যানেল। কিন্তু পাঁচমিনিটে হয়ত একহাঁড়ি জল এসে পৌঁছয়, আগুন লাগা ঘরের কাছে। গাঁয়ের লোকদের সরিয়ে দিল এরা; দুটো স্কাউটিং দড়ি ধরে, ক্যানেল পর্য্যন্ত নিজেরা লাইন করে দাঁড়িয়ে যায়ঃ জনকয়েক লাঠি হাতে দাঁড়ায় জলন্ত বাড়িগুলোর সামনেঃ অনেকে জল ঢালে। একের পর আর এক হাত হ'য়ে মুহূর্ত্তে হাঁড়ি হাঁড়ি জল এসে পৌঁছায় সেখানে। আগুনের ওপর জল ঢালতে থাকে তারা।

গোয়ালের ভেতর চোখ পড়ে রবীনের। আগুন লাগা গোয়ালটার ভেতর একটা গরু আর একটা বাছুর দড়ি ছিঁড়বার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। বেশী আগুন তখন লাগেনি গোয়ালটায়। বাঁশের তৈরী গোয়াল; হয়ত একমুহূর্ত্ত পরেই গোটা ঘরটা জ্বলতে থাকবে, আর তার ভেতর অসহায় দু'টি প্রাণী যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে পুড়ে মরবে! কিন্তু প্রাণের ভয়ত' আছে সবারই ঃ সেইজন্য কেউ খুলে দিতে যায়নি গরু দুটোকে। রবীনের আর ভাববার সময় নেই; সে, একলাঠিতে বেড়াটা ভেঙ্গে গোয়ালে ঢোকে;

মুহূর্ত্তে পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছুরি খোঁজে, গরুর দড়ি কাটতে, কিন্তু নেই। বাইরে তখন লোকেরা চীৎকার সুরু করেছে,—মশাই। বেরিয়ে আসুন, আগুনে পুড়ে মারা যাবেন মশাই। সবই কাণে আসে রবীনের। কিন্তু এতদূর এসে ফিরে যাবে সে! এখনো ফিরবার পথ আছে। তবু শেষ চেষ্টা : সে সজোরে গরুর খুঁটো দুটোকে উপড়ে ফেলে। গরু, বাছুরটা ছুটে বেরিয়ে যায় বাইরে ; কিন্তু ধোঁয়া আর আগুনের ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে যায় রবীনের ; হারিয়ে ফেলে তার বেরোবার পথ। অগত্যা লাঠি দিয়ে আঘাত করে আর এক পাশের দেওয়ালে ; ভেঙ্গে পড়ে খানিকটা অংশ ; সেখান দিয়ে রবীন বাইরে বেরিয়ে পড়ে। গাঁয়ের লোকেরা আর একবার উৎসাহে চীৎকার করে ওঠে—'সাবাস সাহস ভাই! তুমিই মায়ের দুধ খেয়েছিলে।'

তাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমে আগুন নিবে যায় ; আবার অন্ধকার পথ দিয়ে তারা ঘরের পানে ফিরে যেতে থাকে। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। আগুনের আলো থেকে আঁধারে এসে, সে আঁধার আরও কালো মনে হয়। সে অন্ধকারে খুব সাহসী লোকেরও গা ছম্ ছম্ করে। তার ওপর গ্রামের মেটে পথ ; দুপাশে ঝোপঝাড়, এঁদোপুকুর, বাঁশবন আর আম কাঁঠালের বাগান।

মাঝে মাঝে দু' একটা ভাঙ্গা মন্দির ; পোড়ো বাড়ি ; চুণবালি খসা, শুধু ইটগুলোতে ভর করেই যেন দাঁড়িয়ে আছে। তারা হেঁটে চলেছে ত' চলেইছে ; পথের যেন আর শেষ নেই।

শিশির বলে—'বড্ড ক্লান্ত, ঐ পোড়ো বাড়ীটায় একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক্; সকালে বাড়ী ফেরা যাবে।' সকলেরই তখন অবসাদ এসেছেঃ বিশ্রাম গ্রহণে কারও আপত্তি দেখা গেল না তাই।

বাড়ীটা কতদিনকার পুরাণো কে জানে। তবে বেশ বড়। চারিদিকে আবর্জ্জনাঃ ঘরের মধ্যেও ধূলো জমে আছে খুবই। সামনের বড় হলঘরটায় বিছানা নেয় তারা। ঘরের ভেতরের অন্ধকার, বাইরের থেকে আরও জমাট বাঁধা। রাত্রির নিস্তব্ধতার মাঝেও সমস্ত বাড়ীটায় কেমন একটা অস্বাভাবিক দুপ্ দাপ্, গোঁ, গোঁ শব্দ শোনা যায়। দু'চারটা বাদুড়ও হয়ত হলঘরটায় ঝট্‌পট্ করে উড়ে বেড়ায়। হঠাৎ বাইরে একটা ঝড় ওঠে শোঁ শোঁ শব্দে; ঘরের দরজাজানালাগুলো ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলে আবার বন্ধ হ'য়ে যায়। বাতাস ঘরে এসে ঢোকে, তাতে একটা পচা দুর্গন্ধ।

সবার ছোট কাননকুমার; সে হঠাৎ ছুটে এসে ভয়চকিত কণ্ঠে নীতীশকে বলে—জানলায় কী যেন—আর কিছু বলতে পারে না। সবাই আঁৎকে উঠে সেদিকে তাকায়; খোলা জানালার বাইরে দুটো বড় বড় ভাঁটার মত জ্বলন্ত চোখে যেন আগুন বেরিয়ে আসছে। অন্ধকারের মাঝেও চোখে পড়ে, শাণিত ইস্পাতের মত বড় বড় দু'পাটি দাঁত। গায়ে চক্‌চকে কালো লোমগুলো আঁধারের মাঝে বেশ স্পষ্ট ভাবেই দেখা যায়। কারও মুখে কথা

নেই। সবাই স্তম্ভিত, বিস্মিত, হতভম্ব হ'য়ে পড়ে। যা' তারা ধারণা করেনি কোনদিন সেই রকম এক অস্বাভাবিক মূর্ত্তি তাদের চোখের সামনে। উঃ! কি ভীষণ চেহারা!

সতীশ ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছে। সে একটা আধলা ইঁট তুলে নিয়ে জানালার ওপর ছুঁড়ে দেয়। ইঁটটা জানালার গরাদে গিয়ে লাগে। কিন্তু সে মূর্ত্তি জানালা থেকে তখন অদৃশ্য হ'য়েছে।

তারা সকলে ধীর অথচ ত্রস্তপদে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

পরের দিন গ্রামের লোকেরা আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখে, সহরের পল্টনদের নূতন প্রোগ্রাম আরম্ভ হ'য়েছে গ্রামের পোড়ো বাড়ি ধূলিসাৎ করা। তার কারণ তা'রা জানে, আমি জানি এবং আজ তোমরাও শুনলে।

শেষ সমাধান

পাশাপাশি দু'টি গ্রাম; কোলাকুলি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু মাঝখানে একটা পানীয় জলের বড় পুকুর যেন জোর ক'রে একটার থেকে আর একটাকে ছিনিয়ে রাখবার জন্য ব্যবধান রচনা ক'রেছে।...একটা গ্রাম মুসলমান-প্রধান; একটা হিন্দুপ্রধান। কিন্তু গ্রাম দু'টি কাছাকাছি হ'লে কি হয়; মাঝের পুকুরটিই সৃষ্টি ক'রেছে যত গোলমালের। সে শুধু দু'টি গ্রামকেই পৃথক ক'রে দেয়নি, দু'টি গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টি ক'রেছে।

লাঠালাঠি, মারামারি, মাথা-ফাটাফাটি, ঘরপোড়ান, বাড়ী চড়াও করা, এসব যেন দু'টি গ্রামের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। শেষে হয়ত পুলিশ এসে কতকগুলি হিন্দু ও কতকগুলি মুসলমানকে দাঙ্গা করার অপরাধে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে দেয়; কয়েকদিন গ্রাম ঠাণ্ডা থাকে।...তারপর, ওদিকে

সুবিধে ক'রতে না পেরে, মুসলমানপ্রধান গ্রামের অধিবাসীরা স্বগ্রামের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার সুরু করে। আবার হিন্দুরাও নিজেদের গ্রামে অনুরূপ সুযোগ নিতে ছাড়ে না।

পানীয় জলের পুকুরে মুসলমানেরা মাছ ধরবার জন্য পচা 'চার' ফেলে ; তাই দেখে ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে ওপারের হিন্দুরা জলে ময়লা নোঙরা কাপড় কাচে। দু'দলেরই উদ্দেশ্য, 'ওদের স্বাস্থ্যনষ্ট ক'রে হীনবল ক'রে ওদের মেরে ফেলবো' কিন্তু ফল দাঁড়ায় অন্যরকম। দু'টি গ্রামের মধ্যে পানীয় জলের ওই একটি মাত্র পুকুর। তার জল দূষিত হওয়ার ফলে দু'টি গ্রামের অধিবাসীদেরই স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। গ্রামবাসীরা ভাবে···'এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার!' হিন্দুরা ভাবে, 'এ বাবা ভোলানাথের মাহাত্ম্য, পরের মন্দ ক'রতে এসেছিলে, এবার নিজেরা ভোগো!' আর ওদিকে মুসলমানেরা ভাবে···'হিন্দুর স্বাস্থ্যনষ্ট হওয়া খোদাতালার দোয়া ছাড়া আর কিছুই নয়!'

দু'তিন পুরুষ ধ'রে এই ভাবে চ'লে আসছে। তা'দের এরকম দলাদলির কারণ জিজ্ঞেস ক'রলে কেউই সঠিক জবাব দিতে পারে না ; শুধু মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকে ; তারপর আম্‌তা আম্‌তা ক'রে জবাব দেয়ঃ তা'দের বাপ-পিতামহরা তা'দের এই লড়াইয়ে অনুপ্রাণিত ক'রে গেছে ; তাই তা'রাও ক'রছে। কেন যে ক'রছে, তা' ত তারা বলতে পারবে না! এই যে বিনা কারণে দলাদলি, লড়াই, ধর্ম্মের

গোঁড়ামি,—এসবের কথা ভাবতে গেলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়।

মহিম ছেলেবেলা থেকে দু'টি গ্রামের এই ভাব দেখে আসছে। কোন্‌দিন হঠাৎ ঘরে আগুন জ্বলে উঠবে সেই ভয়ে সে সন্ত্রস্ত থাকে দিন রাত। এখন সে উচ্চশিক্ষিত তরুণ বয়সী। সে ভাবে, 'এভাবে লড়াই করবার অর্থ কি? ভারতবর্ষেরই দু'টি বিভিন্ন জাতি···মানুষের অঙ্গের দু'টো হাতের মতই এদের সম্বন্ধ। দু'টির মধ্যে একটিকেও বাদ দিলে চ'লবে না; দু'টিরই সমান দরকার। অথচ একে অপরকে শেষ করবার জন্য এরা উঠে পড়ে লেগে গেছে। ফলে ভারতবর্ষ হীনবল হয়ে প'ড়েছে দিন দিন; হয়ত একদিন সোণার ভারত পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত বিকলাঙ্গ হয়ে পড়বে। এইসব নানা কথা ভেবে মহিম একদিন সকালে মুসলমানপ্রধান গ্রামের দিকে পা চালিয়ে দিল।

বিংশবর্ষীয় বলিষ্ঠ তরুণ···প্রশস্ত তার বক্ষ···উন্নত শরীর··· চোখের মাঝে প্রতিভার দীপ্তি। প্রথমেই সে গিয়ে উপস্থিত হ'লো গ্রামের শিক্ষায়তনে অর্থাৎ পাঠশালায়—যেখানে গড়ে উঠছে, দেশের ভবিষ্যৎ জাতি; শিক্ষা ও সংস্কারের সিঁড়ি তৈরী ক'রে যেখান থেকে শিশুদের চলা সুরু হ'চ্ছে। মহিম প্রথমেই গিয়ে মৌলভী সাহেবকে ক'রলে কুর্নীশ। তিনি মুগ্ধ ও প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মহিমের দিকে। বাঙলা দেশের মুসলমান, বাঙলা-ভাষাই তা'র মাতৃভাষা; বাঙলার গানই তা'র নিজস্ব

সঙ্গীত। মহিমও তাই বাঙ্গলাতেই বললো, "মৌলভী সাহেব! আমি একটা বড় সমস্যায় পড়ে আপনার কাছে এসেছি; আপনি জ্ঞানীলোক, যুক্তি দিয়ে আমার প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে দিবেন কি?"

সস্নেহ মধুরবচনে মৌলভী বললেন—'কী তোমার প্রশ্ন বল!'

"তবে শুনুন—এই যে দু'টি সহোদর ভাইয়ের মত দু'টি গ্রাম আজ দু'তিন পুরুষ ধ'রে ঝগড়াবিবাদ ক'রে আসছে তার কারণ কি, আর তার প্রতিকারই বা কি?

মৌলভী সাহেব কিছুক্ষণ তাঁর বক্ষবিলম্বিত শ্মশ্রুর মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন করতে করতে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, —"হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি জাত নিজেদের এক ভাবতে পারছে না; ধর্ম্মের গোঁড়ামিতে তারা অন্ধপ্রায়, তাই ধর্ম্মের দিক দিয়ে দু'দলই নিজেদের প্রধান বলে ঘোষণা ক'রতে চায়; অপর দলের তা'তে আপত্তি। মুখের কথায় প্রাধান্য স্বীকৃত না হওয়ায় উভয় দল অস্ত্র ধ'রেছে; সেইজন্যই এই লড়াই। প্রতিকারের কথা ব'লছ? যদি কোনও স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি মধ্যস্থ হয়ে উভয় জাতিকে তা'দের নিজ নিজ ভুল এবং বিভিন্ন ধর্ম্ম যে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছুবার ভিন্ন ভিন্ন পথ একথা বুঝিয়ে দিতে পারে, তবেই এ সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে; কিন্তু, দু'দলের মধ্যস্থতা কে করতে যাবে? মধ্যস্থতা করতে গি'য়ে সে ব্যক্তির প্রাণও বিপন্ন হতে পারে।"

মহিম বুঝল,—এছাড়া এত বড় একটা সমস্যার সমাধান হ'বে না। মধ্যস্থ ব্যক্তিকে হ'তে হ'বে হিন্দু-মুসলমান উভয় দলের একান্ত আপনার জন। সে, সেই মুহূর্ত্তে ক'রে ফেললো জীবন পণ। সেই হ'বে মধ্যস্থ ব্যক্তি। তার জন্য আজ থেকে লেগে প'ড়তে হ'বে তাকে।

পরদিন থেকে মহিম নিয়মিত মুসলমানপ্রধান গ্রামে যাতায়াত সুরু ক'রলো। মিশতে লাগলো তা'দের সঙ্গে তা'দেরই একজন হ'য়ে। মহিমের সুমধুর ব্যবহারে, বুদ্ধিমানের মত কথাবার্ত্তায় মুগ্ধ হ'য়ে গেল সমস্ত মুসলমান সমাজ। অল্পদিনের মধ্যেই মহিম জয় ক'রে ফেললো মুসলমানদের মন।

হিন্দুদের গ্রামের জমিদারের ছেলে মহিম ; আভিজাত্যের গর্ব্ব নেই, শিক্ষার গর্ব্ব নেই, অমায়িক তা'র ব্যবহার। সবাই তাকে ভালবাসে আপনার জন ভেবে। অজন্মার বৎসর, প্রজা খাজনা দিতে পারবে না অথচ জমিদারবাবুর কাছে যাবার মত সাহস নেই। গোপনে এসে খোকাবাবু, অর্থাৎ মহিমের সঙ্গে দেখা ক'রে নিজের দুর্দ্দশার কাহিনী জানায়। জমিদারও ছেলেকে ভালবাসেন প্রাণের চেয়ে অধিক ; তাই তা'র অনুরোধ ঠেলতে না পেরে গরীবের সে বছরের খাজনা মাফ ক'রে দিলেন। এইরকম ক'রে দিন চলে ; মহিমও দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

কিন্তু তা'তে কি হয় ? যে আগুন দু'টো জাতির মনে জ্বলছে আজ দু'তিন পুরুষ ধ'রে, তা' কি শুধু কথা দিয়ে নেভানো যায় ?

মহিম যেদিন দলাদলি মেটানোর কথা তুললো খোদা ও ভগবানকে এক অথচ দু'টি বিভিন্নরূপ প্রতিপন্ন ক'রে, সেদিন আগুন যেন জ্বলে উঠলো দ্বিগুণ উৎসাহে, দু'দলই বিবাদ মেটাতে ক'রলো অস্বীকার। এবং উভয় দল একথাও ভাবলো, বিপরীত দল মহিমকে গুপ্তচর হিসাবে পাঠিয়েছে।

মহিম ফিরে এসে সারাদিন গুম্ হ'য়ে রইলো। কিছু মুখেও দিল না সারাদিন। তা'র আপ্রাণ চেষ্টার ব্যর্থতায় সে একেবারে ভেঙ্গে প'ড়লো। তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বসে মহিম ভাবছে। জানালার বাইরে দেখা যায় সুদূরপ্রসারী নীল আকাশ। এক একটা সাদা মেঘ ভেসে চলেছে। হঠাৎ ওপারের আকাশ-কোণে কালো মেঘ জমে; তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মেঘে মেঘে সঙ্ঘর্ষ হয়ে বিজলী চম্‌কায়; গুরু গুরু শব্দে মেঘ-গর্জ্জন হয়। মহিম ভাবে, এ মেঘ যেন দুটো দলের বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। কিন্তু হঠাৎ তার তন্দ্রা টুটে যায় বাইরের হৈ রৈ চীৎকারে। বাইরে বেরিয়ে দেখে, বড় পুকুরের পারে অসংখ্য মশাল জ্বলে উঠেছে আর তার উজ্জ্বল আলোতে লাঠি, সড়কী ও অস্ত্রশস্ত্র দেখা যাচ্ছে। মহিম দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না; ছুটলো সেদিকে উন্মাদের মত। কিন্তু তার আগেই দু'দলে লড়াই বেধে গেছে। মহিম ক্ষিপ্রগতিতে ব্যূহের ভিতরে প্রবেশ করতে করতে চীৎকার করে উঠলো— "ভাই সব! ক্ষান্ত হও, লড়াই থামাও।" কিন্তু তখন উভয় দলের শরীরে রক্তস্রোত প্রবল ও দ্রুত হয়ে উঠেছে। লড়াই

চললো পূরোদমে। ছু'চার জন পড়লো আহত হয়ে। হঠাৎ

ভিড়ের মধ্যে কে চীৎকার করে উঠলো—"আরে, হায়, হায়, কা'কে হত্যা করলে! এ যে আমাদের মহিম"!

কোথা দিয়ে যেন ভোজবাজীর মত কী হ'য়ে গেল। কথায় যে কাজ হয়নি, শুধু ঐ নামের উচ্চারণেই সেই কাজ হ'য়ে গেল। জনতার সমস্ত লোক লাঠি, সড়কী ছুড়ে ফেলে শুধু চীৎকার করতে লাগলো—"মহিম! দাদাজান!...ভগবান! খোদাতাল্লা! এ কী করলে!

লড়াই থেমে গেল। মুমূর্ষু মহিম! তখন চৌচির হ'য়ে গেছে তার মাথা। রক্তবন্যা ব'য়ে মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছে। দু'দলের মাঝখানে সে শুয়ে ব'লতে লাগলো অতি ক্ষীণ স্বরে—"ভাই সব! এ নশ্বর প্রাণের জন্য তোমরা দুঃখ ক'রো না; আজ আমার সুখের মৃত্যু হবে, যদি শুধু আমার মৃত্যুশয্যায় আমি হিন্দুমুসলমান ভাইদের এক হ'তে দেখি। শুধু আমার মৃত্যুসময়ের অনুরোধ, যদি তোমরা আমায় সত্যিই ভালবেসে থাক, তবে আজ থেকে ঝগড়াবিবাদ ছেড়ে দু'দল ভাই ভাই হ'য়ে মিলে যাও; তবেই আমার আত্মা শান্তি পাবে।" মহিমের গলার স্বর ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে এল। হিন্দুমুসলমান জনতার অশ্রুভরা ঝাপ্‌সা চোখের সামনে সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে চোখ বুজলো।

তারপর, চার পাঁচ বছর কেটে গেছে। আজ যদি তোমরা সেই গ্রামে যাও, তবে দেখতে পা'বে "মহিম-বাঁধের" পাড়ে দু'টী গ্রামের একতার নিশানা স্বরূপ মহিমের নাম খোদাই করা একখানা বড় চাংড়াপাথর জলের ওপর ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে; আজ তোমরা জাতিতে হিন্দুই হও বা মুসলমানই হও, দু' গ্রামের যে

কোনও একটিতে গেলে, গ্রামবাসীর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হ'য়ে যাবে, এ আমি হলপ ক'রে ব'লতে পারি।

সমাপ্ত

"**ভাইবোন" বলেন**—শিশু-সাহিত্যের বিখ্যাত লেখকদের মনোরম রচনা সংগ্রহ। বিরাট অভিধানের মত মোটা, পড়িতে পড়িতে পূজার ছুটি পার হইয়া যাইবে। দশ আনার বই যারা ছ'আনায় দেন তাঁহাদের পাঁচসিকার বইয়ের কত দাম হওয়া উচিত, রুল অফ থ্রি করিয়া আবিষ্কার করিতে হয়। ছবি ও গেট-আপ প্রলোভনময়। নূতন জামা কাপড়ের চেয়ে এ বই পেলে ছেলেমেয়েরা বেশী খুসি হইবে।

"**রংমশাল" বলেন**—এত সস্তায় বই কেমন করে বার করেন ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। শুনেছি তাঁদের উদ্দেশ্য বাংলার ঘরে ঘরে তাঁদের বই পৌছুক। **আরতি** তোমাদের পূজার ছুটী কাটাবার মস্ত বই। গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধে সবশুদ্ধ ৪৯টী। ছবিও অনেক। বইটির আয়তনের তুলনায় দাম সস্তাই বলতে হবে।

"**মাসপয়লা" বলেন**—এই বৃহৎ পূজা-বার্ষিকী খানা হাতে পাইলে লম্বা ছুটির কয়দিনের জন্য শিশুরা নিশ্চিন্ত হইবে। এতে গল্প, হাসির কবিতা, মজার ছবি প্রভৃতি আছে। শিশুমহলে **আরতি** আদর লাভ করিবে।

"**রামধনু" বলেন**—এই বিপুল কলেবর বার্ষিকী খানা নিয়ে শিশু-রাজ্যে হাজির হয়েছেন। এতে বাংলার বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিকদের লেখা অজস্র গল্প ও নানা বৈচিত্র্যময় প্রবন্ধ দেওয়া হয়েছে—ছবিও অনেক আছে। এ বই শিশুমনের খোরাক যোগাতে পারবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এর পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৫০, দাম মাত্র ১।০।

"**মৌচাক" বলেন**—এই বার্ষিকীখানি সম্পাদন করেছেন শিশুদের প্রিয় লেখক শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু। হাসির কবিতা ও মজার গল্পের এই বইখানি পড়িয়া শিশুরা মুগ্ধ হইবে।

"**পরিকথা" বলেন**—দিব্য অঙ্গ-লাবণ্যে মনোহর বর্ণিকায় শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসুর হাত ধরিয়া "**আরতি**" বাহির হইল। ইহাকে সাজাইয়াছেন শ্রীযুক্ত সজনী দাস, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। পাঁচসিকা দর্শনী দিয়া কোথায় কিরূপ মানাইল বিচার করুন।

এ ছাড়া 'আরতির' আরও অনেক
প্রশংসাপত্র ও সমালোচনা পাইয়াছি,
কিন্তু স্থানাভাব বলে আমরা এখানেই
ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম।